কাহিনী

শ্রীগুরুদাস আদক

ভাদ্র, ১৩১৯

দশ আনা ।

প্রকাশক
শ্রীপাঁচুদাস আদক
৩, চাউলপটী লেন,—ভবানিপুর, কলিকাতা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা।
বি, বি, চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

করকমলেষু—

নিবেদন

'কাহিনী' প্রকাশিত হইল। ইহাতে কতিপয় পুণ্যশীলা আদর্শ ভারত-মহিলার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি গল্প স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত, এম, এ, লিখিত 'The Heroines of Ind' নামক পুস্তকের ভাব লইয়া রচিত।

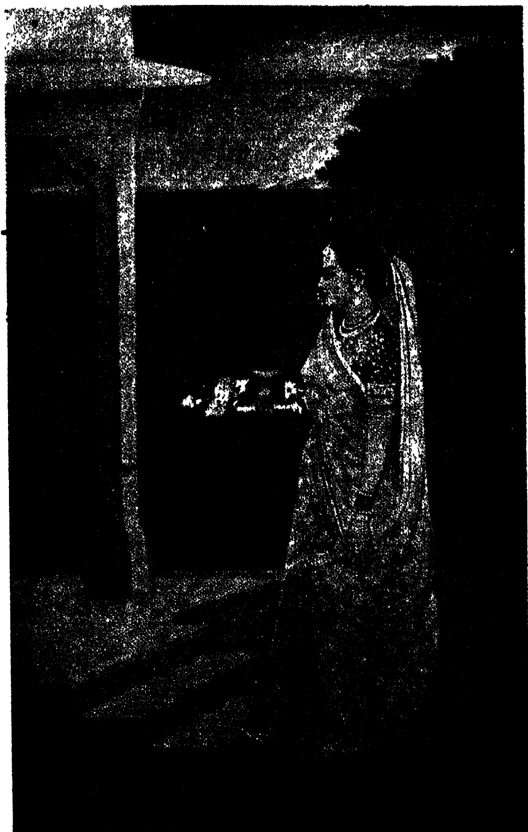
'কাহিনী'র শোভাবর্দ্ধনের জন্য কয়েকটি চিত্র প্রদত্ত হইল। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা তাঁহার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র 'কাহিনী'তে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া আমায় চিরবাধিত করিয়াছেন। এই চিত্র দুইখানি পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। আমি এই অবসরে তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরিশেষে স্বীকার করিতেছি, আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ পাল বি, এ, এই পুস্তক প্রকাশে আমায় অনেক প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন; তাঁহার উৎসাহ ব্যতীত এ পুস্তকখানি কখন প্রকাশিত হইত কি না জানি না। ইতি—

ভবানীপুর
ভাদ্র, সন ১৩১৯। শ্রীগুরুদাস আদক

সূচী

মীরাবাঈ	...	...	১
কর্ম্মদেবী	...	...	১৩
তারাদেবী	...	...	২০
পান্না	...	...	৩৪
গণোর রাজমহিষী	...	...	৪২
দুর্গাবতী	...	...	৫০
যোধপুর রাণী	...	...	৫৯
রাণী ভবানী	...	...	৬৬
অসামান্যা	...	...	৭৯
অহল্যা বাঈ	...	...	৮৯
কৃষ্ণকুমারী	...	...	৯৯



মীরা বাঈ

চিত্রকর—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

কাহিনী।



মীরাবাঈ।

১

ভারতবর্ষেরর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই রাখালবালকগণের ক্রীড়াকুঞ্জে, যুবকদিগের সান্ধ্য-মজলিসে এবং ধনীর বিলাসকক্ষে যে রাগিনী অনুরণিত হইয়া উঠে, তাহার স্বরে একটি পরিচিত নামের ঝঙ্কার প্রায়ই শুনা যায়! এই নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধা মহিষী মীরাবাইয়ের।

রাজপুতানার অন্তর্গত নিরতা একটি ক্ষুদ্র মনোরম গ্রাম। গ্রামটির চারিপার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড়। সেই পাহাড়ের গাত্র ভেদ করিয়া সঙ্কীর্ণ নদীগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামটির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, দেখিলেই মনে হয় যেন প্রকৃতি-রাণী তাঁহার সমুদয় সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া এই

ক্ষুদ্র স্থানটীকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই স্থানেই আমাদের স্বনামধন্যা সতীলক্ষ্মী মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতির দুলালী মীরাবাইয়ের তুল্য রূপবতী নারী তৎকালে রাজপুতানায় আর দ্বিতীয় ছিল না, তাই তিনি অনেকের নিকট 'জ্যোতির্ম্ময়ী' নামেও পরিচিতা।

অতি বাল্যকাল হইতেই রমণীসুলভ যাবতীয় গুণ—দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। দেবতার প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ও ঐকান্তিক বিশ্বাস। এতদ্-ব্যতীত সঙ্গীত ও ছড়া রচনায় তাঁহার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া বালক বৃদ্ধ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিত, এত অল্প বয়সে ইনি এ সকল বিষয় কিরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেন! ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তাহার ছড়া রচনা করিয়া যখন সুললিত স্বরে তিনি তাহা গাহিতেন, তখন কত বৃদ্ধেরও চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিয়া যাইত। ভগবানে এমন আত্ম-নির্ভর জগতে প্রকৃতই দুর্লভ। কৃষ্ণলীলা গাহিতে গাহিতে মীরা কতদিন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছেন, আবার জ্ঞানলাভে

কখন কখন সেই গোকুলবিহারী নবঘনশ্যামকে মনে করিয়া কাঁদিয়া কত আকুলও হইয়াছেন!

ক্রমে বাল্য কাটিয়া যৌবন আসিল। চিতোরের মহারাণা কুম্ভসিংহের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হইয়া গেল। মহারাণাও বাল্যে কবিতাপ্রিয় ছিলেন। নববিবাহিতা বধূর সহিত কিছুকাল বেশ একরূপ সুখে কাটিল, কিন্তু দিন চিরকাল সমান যায় না।

মীরা প্রায় সর্ব্বদাই সখিগণ সহ কৃষ্ণলীলায় বিভোরা। কখন বা কোন সখীকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া স্বয়ং রাধিকা হইয়া তাহার বামে দাঁড়াইতেন, আবার কখন নিজেই শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া শ্রীমতীর মানভঞ্জনের পালা গাহিতেন। মহারাণা প্রথম ইহাতে বেশ আনন্দ পাইলেও ক্রমে এসব আর ভাল লাগিত না। তিনি যাহা চান, মীরার নিকট হইতে যেন তাহা পান না—ইহাই তাঁহার আক্ষেপ। তরুণ বয়সে তাঁহার যাহা আকাঙ্ক্ষা, মীরার পক্ষে তাহা মুক্তির পথে দারুণ বাধা।

২

দিল্লীর রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া মোগল সম্রাট আকবর মীরা দেবীর সঙ্গীত-শক্তির প্রশংসা শুনিলেন। তিনি চিরদিনই গুণগ্রাহী। তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমানে ভেদজ্ঞান ছিল না। এই সহৃদয়তা গুণেই তিনি একদিন বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মীরাদেবীর সঙ্গীতের সাতিশয় প্রশংসা শুনিয়া তাহা শুনিবার জন্য আকবরের একান্ত আগ্রহ হইল। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর চিতোর মোগল সাম্রাজ্যের অধীন না হইলেও উভয় রাজ্যের সহিত তখন কোন শত্রুতা ছিল না। আকবর একবার মনে করিলেন, মহারাণা কুম্ভ সিংহের নিকট প্রস্তাব করিয়া দেখিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পদ্মিনীর কথা স্মরণ হওয়ায় সে সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করিলেন। তিনি জানিতেন, হিন্দুর পর্দ্দা উদ্‌ঘাটিত হইবার নহে; নারীর সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দু অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে। এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া পরিশেষে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গায়ক-প্রবর তান-

সেনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা উভয়ে একদিন ছদ্মবেশে চিতোর মন্দিরে গিয়া মীরা দেবীর সঙ্গীত শুনিয়া আসিবেন।

তাহাই হইল। তাঁহারা উভয়ে ছদ্মবেশে মীরা দেবীর প্রাণ মাতান সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। আকবর তাঁহার সঙ্গীতে এতাদৃশ মোহিত হইয়া পড়িলেন যে, আপন অবস্থা ভুলিয়া তিনি মীরাদেবীর পদপ্রান্তে পড়িয়া তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার সার্থকতার বারবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আসিবার সময় বস্ত্র মধ্য হইতে একছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা বাহির করিয়া মীরার হস্তে তাহা প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, 'দেবী, এই বহুমূল্য মালা ছড়াটি আপনি দেবপ্রতিমার গলদেশে পরাইয়া দিন—দেখিয়া আমি চরিতার্থ হই।'

মীরা সেই মালা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজপুত! তুমি এ বহুমূল্য মালা কোথায় পাইলে?'

আকবর প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'দেবী! যমুনায় স্নান করিবার কালে আমি এই মালা কুড়াইয়া পাই। এ বহুমূল্য মালা আমাদের উপযোগী নহে, তাই দেবতার চরণে ইহা অর্পণ করিলাম।'

মীরা তাঁহার দেবভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মালা ছড়াটি দেবতার চরণে উৎসর্গিত করিলেন। আকবরও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই মাল্য-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মীরাদেবীর ভাগ্যাকাশে এক প্রবল বাত্যার সূচনা হইল। মহারাণা লোক-পরম্পরায় এই মালা-প্রাপ্তির সংবাদ পাইলেন। তিনি মালা দেখিতে চাহিলেন। মালা আনীত হইল। তিনি সে বহুমূল্য মুক্তার মালা দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া গেলেন। জহুরিরা আসিয়া তাহার দর কষিল, দশলক্ষ মুদ্রা! কে এই বহুমূল্য মালা দিয়া গেল! ' চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল—সংবাদ আনিতে। সংবাদ আসিল—মোগল সম্রাট আকবর ছদ্মবেশে দেবীর গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। রাণা শুনিয়াই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—জ্ঞানশূন্যের ন্যায় উত্তর দিলেন, 'কে আছ—এই দণ্ডেই মীরার জীবন নাশ করিয়া আমার বংশের কালিমা দূর কর।'

৩

আদেশ প্রচারিত হইল ; কিন্তু কেহই সে বীভৎস কার্য্যে অগ্রসর হইল না। রাণা অন্য উপায় না দেখিয়া মীরাকে আত্মহত্যা করিবার জন্য একখণ্ড পত্রে আদেশ লিখিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিলেন। মীরাদেবী সেদিন যখন দৈনিক পূজা সমাপনান্তে মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সেই আদেশ-পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হইল। তিনি একবার মাত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একটিবারও কি তাঁহার চরণ দর্শন মিলিবে না?' পত্রবাহক মস্তক নত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'মহারাজের, বোধ হয়, সে আদেশ নাই।' মীরা তখন আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়াই পত্রবাহককে বলিলেন, 'মহারাণাকে বলিও, রাণী তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছে।' ইহা বলিয়া রাণী অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

*　　*　　*

রজনীর গভীর অন্ধকারে মীরাদেবী বিলাস-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণীর বেশে রাজগৃহ

পরিত্যাগ করিলেন। কেহই জানিল না, মীরাদেবী আজ সকলকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া কোথায় চলিয়াছেন! সেই অন্ধকারে পথ অতিক্রম করিয়া মীরা শেষে এক নদীর ধারে আসিয়া দাড়াইলেন,—কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার জীবন-মরণের আরাধ্য দেবতার নাম স্মরণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে নদীর জলে ঝাঁপ দিলেন।

ভগবানের অসীম দয়া। কোথা হইতে কি হইল, মীরা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! কেবলমাত্র তাঁহার মনে হইল, কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন! শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিলেন, 'মীরা! তোমার স্বামীর আদেশ রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু এ পৃথিবীতে তোমার যে আরও অনেক কাজ আছে। আমার মহিমা প্রচার করিবার জন্যই যে তোমার জন্ম। যাও, তোমার কার্য্য কর গিয়া।'

* * *

প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস চতুর্দ্দিকে বহিয়া ছুটিয়াছে। মীরাদেবী চাহিয়া দেখিলেন, তিনি

নদীর ধারে বালুচরের উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের রশ্মিতে চারিধারে বৃক্ষের শিরগুলি অনেক খানি রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, তাহার মধ্যে কোন মনুষ্য-মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল না। তখন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নদীর তীর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে তিনি পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অজানা পথে চলিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। ভগবানে আত্ম সমর্পণ করা অবধি তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই ছিল না। কিছুদূর যাইবার পর কতকগুলি রাখাল বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাছা, আমি বৃন্দা-বনের পথিক——বৃন্দাবনের পথ কোথায় আমায় বলিয়া দিতে পার?' বালকেরা তাঁহার মিষ্ট কথায় তৃপ্ত হইয়া বলিল, 'মা, তুমি পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছ, দেখিতেছি। আমাদের নিকট কিছু দুধ আছে। এইটুকু পান করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমরা তোমাকে বৃন্দাবনের পথে রাখিয়া আসিতেছি।' মীরাদেবী বালকদিগের কথা এড়াইতে পারিলেন না।

বালকদিগের সহিত প্রাণ ভরিয়া হরিগুণগান

করিতে করিতে মীরাদেবী বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। পথের লোক তাঁহার গান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না—ভগবানে প্রাণ সমর্পণ করিয়া আপন মনেই বিভোর-চিত্তে চলিয়াছেন—পশ্চাতে তাঁহার অসংখ্য মুগ্ধ ভক্ত। যখন তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, তখন আর তাঁহার আনন্দ ধরে না।

অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার নাম বৃন্দাবনে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সুমিষ্ট কৃষ্ণলীলা শ্রবণের জন্য অসংখ্য ভক্ত দলে দলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাড়াইত। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মীরা এখন মেবারের মহারাণী নহেন—ভিখারিণী—প্রেম-ভক্তির আদর্শ মূর্ত্তি। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে অতৃপ্ত ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার গান শুনিয়া কায় মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে তৎকালে রূপ গোস্বামীর ন্যায় ভগবৎ ভক্ত আর দ্বিতীয় ছিল না। অনেকে তাঁহাকে ভগবানেরই অংশ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কথনও স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না; কিন্তু

মীরাদেবীর ঐকান্তিক ভক্তি ও ভগবানে অচল নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে কন্যার ন্যায় সস্নেহে কাছে রাখিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠের হরিনাম সংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বিভোর হইয়া পড়িতেন।

৪

মীরাদেবীর সঙ্গীতের প্রশংসা ভারতের প্রতি দেশে ধ্বনিত হইতে লাগিল। চিতোরের মহারাণা কুম্ভ সিংহও তাহা শুনিলেন। আজ তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, মীরা সত্যই কি তাঁহার বংশে কালিমা লেপন করিয়াছেন, না বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন! আজ মীরাদেবীর নাম লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত, কিন্তু কই তাঁহার কথা ত কেহ বলে না। বিশেষতঃ সমগ্র মেবারবাসী যখন তাঁহাকে চাহে, তখন তিনি আর তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেন না; স্থির করিলেন, মেবারলক্ষ্মীকে আবার মেবারে আনিবেন।

একদিন ছদ্মবেশে মহারাণা বৃন্দাবনে আসিয়া

দেখা দিলেন। তিনি দেখিলেন, মীরা মন্দিরে বসিয়া হরিনাম গান করিতেছেন—সে কি মধুর নাম, যেন স্বর্গ হইতে সুধা ক্ষরিতেছে! মহারাণা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, 'দেবি! আমায় ভিক্ষা দাও।'

মীরা বিনীত স্বরে বলিলেন, 'আমি ভিখারিণী ধনীর দুয়ারে যান, সেখানে ঈপ্সিত ভিক্ষা মিলিবে।'

তখন মহারাণা ছদ্মবেশ দূর করিয়া মীরার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'মীরা, আমায় ক্ষমা কর—আজ তুমি যদি ভিখারিণী, তবে রাজরাণী কে?'

মীরা সম্মুখে জীবন-দেবতা স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ হইতে আপনা আপনিই যেন উচ্চারিত হইল, 'স্বামিন, প্রভু, এতদিনে এ অধীনীকে স্মরণ করিয়াছেন!'

মীরাদেবী গোস্বামীর পদধূলি লইয়া চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চিতোর নগরী আবার আনন্দ-স্রোতে ভাসিল। এখন হইতে তিনি বৎসরের অর্দ্ধভাগ চিতোরে এবং অপর অর্দ্ধ ভাগ বৃন্দাবনে যাপন করিতেন।

কর্ম্মদেবী।

কর্ম্মদেবী কোন স্বনামখ্যাত রাণা, মহারাণা অথবা কোন রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের কন্যা না হইলেও রূপে ও গুণে রাজকন্যারই সমতুল ছিলেন। তাঁহার পিতা অরন্তি নিবাসী সামান্য মাহিলদিগের প্রধান দলপতি। কর্ম্মদেবীর অসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া মন্দরা-ধিপতি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠান। মাহিলপতিও তাঁহার এই অনুগ্রহে আপনাকে বিশেষ সম্মানিত জ্ঞান করিয়া শুভ পরিণয়ের দিনস্থির করিলেন।

কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন। এ ক্ষত্রে তাহাই হইল। পূর্ব্ব হইতেই বিবাহের সরঞ্জাম চলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ এক বিদেশীর আগমনে সব গোলমাল হইয়া গেল। এই বিদেশী এক অরণ্য প্রদেশের অধিপতি—নাম সাধু। যুদ্ধ-কৌশলাদির দ্বারা নিজ বীরত্ব প্রদর্শনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। ভারতের এমন কোন রাজ্য

ছিল না, যেখানে তিনি একবারমাত্রও তাঁহার অসীম বীরত্ব না দেখাইয়াছেন। সমগ্র দেশ তাঁহার ভয়ে কম্পিত। মাহিলপতি পূর্ব্বে তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা ও বিক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কখন চক্ষে দেখেন নাই। একদিন তিনি শুনিলেন, সাধু অরন্তি-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং আতিথ্যগ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সাধু তাঁহার সদাশয়তায় আপ্যায়িত হইয়া অরন্তিতে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিলেন।

কর্ম্মদেবী বীর যুবককে দেখিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার অতুল বীরত্বের কথাও শুনিয়াছিলেন। যুবকের বীরোচিত সুঠাম মূর্ত্তি বালিকার কোমল হৃদয়ে রেখা পাত করিল। সেই ভালবাসা পরিণামে বিষময় ফল উৎপাদন করিল।

কর্ম্মদেবী তাঁহার সখিদিগের নিকট হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিলেন। ক্রমে সেই কথা তাঁহার মাতার কর্ণগোচর হইল। তিনিও আবার স্বামীর নিকট তাহা উত্থাপন করিলেন। মাহিলপতি শুনিয়া স্তম্ভিত

হইলেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—কেমন করিয়াই বা পূর্ব্ব সম্বন্ধ ছিন্ন করিবেন? না করিলে নিশ্চয়ই মন্দ্রাধিতি অপমান বোধ করিয়া সসৈন্যে অবন্তি-প্রদেশ আক্রমণ করিবেন—ফলে অনর্থক রক্তপাত! সে কি ভীষণ দৃশ্য! না, তাহা কখনই হইবে না। সামান্যা বালিকার কথায় দেশের শান্তি নষ্ট—না, কখনই হইতে পারে না।

স্নেহের জয় সর্ব্বত্রই। কর্ম্মদেবী তাঁহার এক মাত্র কন্যা। তিনি তাঁহার মনে ব্যথা দিতে পারিলেন না। অগত্যা সাধুর সহিতই তাঁহার পরিণয় স্থির হইল। যথা সময়ে মাহিলপতি সাধুর পিতৃ-সকাশে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে খুব ধূমধামের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর দিবস বরবধূ নিজ আলয়ে চলিলেন।

মন্দ্রাধিপতি দত্ত বাক্য ভঙ্গে মাহিলপতির প্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না, কিন্তু কোনরূপে প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে চারি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বরবধূ যে

পথ দিয়া গমন করিবেন, সেই পথে গোপনে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কতক পথ বরবধূ নির্ব্বিঘ্নে চলিলেন। আনন্দে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ। কোন বিপদের কথাই তাঁহা-দের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। দেখিলেন, সম্মুখে অসংখ্য সৈন্য তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া আছে। অগ্রসর হইলে, যুদ্ধ সুনিশ্চিত।

সাধু তৎক্ষণাৎ সকলকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে বলিলেন। মন্দ্রাধিপতির সৈন্য সংখ্যা সমধিক। তিনি বিপক্ষীয়গণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়—এই কৌশলে অতি সহজেই শত্রুসৈন্য পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে।

সাধু এবং মন্দ্রাধিপতি—উভয়েই আত্মপক্ষীয় সৈন্যের যুদ্ধ-কৌশল দেখিতেছিলেন। অবশেষে সাধু স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্দ্রাধিপতি তাহাই চাহিতেছিলেন। সাধু প্রাণাধিক কর্ম্মের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। কর্ম্মদেবী তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'প্রিয়তম! আজ আমিও তোমার যুদ্ধ কৌশল দেখিব। আর যুদ্ধক্ষেত্রই

যদি তোমার উপযুক্ত শয্যা হয়, তাহা হইলে এ হতভাগিনীও তোমার সঙ্গিনী হইবে।' বারবার যুদ্ধের আহ্বান আসিল, কিন্তু কর্ম্ম তাঁহাকে অতি সত্বর বিদায় দিতে পারিলেন না। মিলনের এই প্রথম মুহূর্ত্ত! বাসরের মধুর রাগিণী এখনও যে কাণে বাজিতেছে—ইহারই মধ্যে মৃত্যুর কঠোর আহ্বান! কে যেন তাঁহার মনের মধ্যে বলিয়া দিল, ইহ জগতে বুঝি এই শেষ দেখা! সাধু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সত্বর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন।

উভয় বীরই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই উভয়কে অগ্রে আঘাত করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। সাধুই সর্ব্বাগ্রে মন্দ্রাধিপতির গলদেশে আঘাত করিলেন। তিনিও নিমেষের মধ্যে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। কর্ম্মদেবী দেখিলেন, মন্দ্রাধিপতির অসি তাঁহার স্বামীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উঠিয়াছে। উভয়েই চকিতে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। মন্দ্রাধিপতি মূর্চ্ছিত হইলেন মাত্র, কিন্তু সাধুর জীবনদীপ একেবারেই নির্ব্বাপিত হইল।

এই বিপদে সকলের চক্ষে জল-ধারা বহিল, কিন্তু

কর্ম্মদেবীর চক্ষে জল নাই। তিনি স্বয়ং তাঁহার স্বামী-পরিত্যক্ত সৈন্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার অসি গ্রহণ করিলেন এবং সেই অসির দ্বারা আপন বামহস্ত ছেদন পূর্ব্বক এক বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া বলিলেন, 'এই হস্ত আমার শ্বশুর ঠাকুরকে প্রদান করিয়া বলিও—ইনিই আপনার পুত্রবধূ।' তৎপরে তিনি তাঁহার সঙ্গিগণকে অপর হস্ত ছেদন করিয়া পিতৃসকাশে তাহা লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আরও কহিলেন, 'তাঁহাকে বলিও, তাঁহার কন্যা বীর মাহিলরমণীর মতই সগৌরবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে।' কিন্তু কেহই তাঁহার সে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল না। তখন তিনি সিংহিনীর ন্যায় বিক্রমে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'কি? তোমরা তোমাদের অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করিবে, এত সাহস?' তখন এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, 'জননী, আমরা আপনার আদেশ অমান্য করিতে পারি না, কিন্তু আমরা যে আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কেমন করিয়া এই নৃশংসের কার্য্য করিব? আর একান্ত যদি আপনার

অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এ দাসই আপনার এ আদেশ পালন করিবে।' কর্ম্মদেবী নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—আর তাঁহার হস্ত ঠিক পূর্ব্বেরই মত স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইল।

তাহার পর যুদ্ধ স্থলেই চিতা সজ্জিত হইল। সেই চিতায় কর্ম্মদেবী চিরদিনের জন্য স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

তারাদেবী।

১

থড়া রাজপুতানার এক ক্ষুদ্র জনপদ। রতন সিংহ ইহার শাসন-কর্ত্তা। রতন সিংহ সুপুরুষ ও সাহসী বীর, কিন্তু উপযুক্ত সৈন্যবল না থাকায় তাঁহাকে অনেক সময় বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে। মুসলমান সৈন্যগণ বার বার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিত, দুর্গ অবরোধ করিত, নগর লুণ্ঠন করিত। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি স্থানীয় রাজন্যবর্গ ও মেবারের মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মুসলমানের উৎপীড়নে রাজপুতানার তখন সে গৌরব নাই। রাজপুতানা তখন হীনবীর্য্য, হৃতবল। অন্যের কথা কি, স্বয়ং মহারাণাও মুসলমানের অত্যাচারে সশঙ্কিত। সকলেই নিজ নিজ রাজ্য-রক্ষায় ব্যস্ত; কেই-বা রতন সিংহের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিবে? কেহই

আসিল না। নিঃসহায় রতনসিংহ এবার শেষ বারের জন্য অদম্য উৎসাহে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য দিল্লী-অধিপতির অসংখ্য সৈন্য-সাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গেল।

রতন সিংহ আজ রাজ্যচ্যুত। তাঁহার বড় সাধের থড়া,—মুসলমানের অধিকারে। তিনি সুদূর বিদ্‌নরে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। কে জানে, এই সুদূর বিদ্‌নরে তিনি তাঁহার সাধের থড়া ও তাহার অধিবাসিগণের মঙ্গল কামনায় কোন দৈবশক্তির সাধনা করিতেছিলেন কি না! তিনি তাহাদিগকে একদিনের জন্যও, এমন কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু সৈন্যহীন, উপায়হীন, অর্থহীন, স্বরাজ্য-চ্যুত এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র রতন সিংহ সেই অগণিত মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে কি করিতে পারেন?

মানুষ আশার দাস। আশা মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে। রতন সিংহ আশা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একদিন না একদিন এমন দিন আসিবে, যখন তাঁহার সাধের থড়া আবার

তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আসিবে—থড়ার অধিবাসিগণ আবার তাঁহাকে আহ্বান করিবে! তাঁহার স্নেহের কন্যা তারাই এখন একমাত্র আশার স্থল! রতন সিংহের পুত্র ছিল না। তারাকেই তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে দেখিতেন এবং সেইরূপ ভাবেই তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তারা অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি রণ-কৌশল অতি সুন্দররূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যখন রতন সিংহ যুদ্ধে যাইতেন, তারা তাঁহার অনুগমন করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অবিচলিত ভাবে যুদ্ধ করিতেন। ভয় কাহাকে বলে, তারা তাহা জানিতেন না। তারার এই সাহসিকতা দেখিয়া তাঁহার সমবর্ষীয়ারা বলিত, কালে তারা বীরবালা নামে পরিচিতা হইবেন। সৌন্দর্য্যেও তারা রাজপুতানায় অতুলনীয়া। স্ত্রীজনোচিত সকল সদ্গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও সময় সময় তারা বীরত্বে সিংহীসদৃশ—সাহস ও নৈপুণ্যে রাজপুতবীরগণের সমতুল্যা বলিয়া তাঁহাকে বোধ হইত।

রতন সিংহ অনেক সময়ে মনে ভাবিতেন, যদি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে না

পারেন তাহা হইলে তারাকে তিনি যে শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন, সেই শিক্ষা-প্রভাবেই তারা একদিন না একদিন তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন। সেই জন্যই তিনি স্থির করিলেন, যে ব্যক্তি স্ববাহুবলে তাঁহার রাজ্য প্রবল প্রতাপশালী দিল্লী-সম্রাটের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার একমাত্র কন্যা তারাদেবীর পাণিগ্রহণ করিবেন। তারাদেবীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণের ভূয়সী প্রশংসা রাজপুতানাময় ব্যাপ্ত ছিল। অনেক রাজপুত্র তারাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থী হইয়া আসিলেন। কিন্তু রতন সিংহের কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সকলেই ব্যর্থমনোরথে গৃহে ফিরিলেন।

এইরূপে অনেক রাজপুত্র আসিলেন, যাইলেন। অবশেষে মেবারের মহারাণার দ্বিতীয় পুত্র জয়মল্ল তারাদেবীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থী হইয়া আসিলেন। রতন সিংহ মহারাণার অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজা। মহারাণার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ, বড় আনন্দের কথা। কিন্তু এ সময়ও তাঁহার মন অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত

কাহিনী।

বলিলেন, "যিনি আমার ক্ষুদ্ররাজ্য থডাকে মুসলমানের দুর্জ্জয় হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করিবেন, অপরে নহে।"

জয়মল্ল ভীরু, কাপুরুষ-প্রকৃতি। রতন সিংহের এ বীরোক্তি তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই তিনি অতিশয় ঘৃণিত কঠোর ভাবে তাঁহার প্রতিজ্ঞার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। রতন সিংহ কুমারের নীচতা সহ্য করিতে পারিলেন না। নিমেষে তাঁহার কটিবন্ধ হইতে অসি ঝলসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই কুমারের রক্তাক্ত কলেবর ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। †

* * *

মহারাণা দরবারে বসিয়া পুত্রের নিধন-বার্ত্তা শুনিলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মুখমণ্ডলে মলিনতার ছায়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন, "পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।

† কাহারও মতে, জয়মল্ল বিনানুমতিতে তারাদেবীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রতন সিংহ তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া এই শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আমার পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করিলাম।”

মহারাণার মহত্ত্বে সকলে অভিভূত হইল

• •

২

পৃথ্বীরায় মহারাণার অন্যতম পুত্র। কোন কারণে তিনি পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আজ মহারাণা সস্নেহে আবার তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। পৃথ্বীরায়ের সরল অন্তঃকরণ, সস্নেহ আচরণ চিতোরবাসীর হৃদয়ের অন্তঃস্তলে যে সহানুভূতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল, কয়েক বৎসরের অদর্শনে তাহা মুছিয়া যায় নাই। তাই আজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য চিতোরবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ফুলের আভরণ, ফুলের তোরণ, ফুলের মালায় আজ যেন চিতোর নগরী হাসিতেছে। প্রকৃতি-দেবী নব আভরণে সজ্জিতা হইয়া প্রিয় সহচরী দিক্‌বধূর সহিত যুবরাজের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, চিতোর জননী পাঞ্চজন্যের মধুর নিনাদে সন্তানের মঙ্গল ঘোষণা করিতেছেন।

কাহিনী।

বহুদিনের পর পৃথ্বীরায় আবার চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন। চিতোরবাসী বহুদিনের পর তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইল। তাঁহার ন্যায় যোদ্ধা তৎকালে রাজপুতানায় আর কেহ ছিল না। সমগ্র রাজপুতানায় যদি কেহ তারাদেবীর উপযুক্ত পাত্র থাকেন, তবে তিনি পৃথ্বীরায়। তারাদেবী পৃথ্বীরায়কে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ও তারাদেবীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদিগের সুখের পথে এক ভীষণ বাধা—সে বাধা, রতন সিংহের দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা।

পৃথ্বীরায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রাণের তারাকে আমার করিতে পারি, তবেই আবার চিতোর রাজ্যে ফিরিয়া আসিব, নচেৎ এ জীবনের সমাপ্তি, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে।' দুইশত উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি থড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারাদেবীও তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন।

ক্রমাগত অশ্বচালনার পর তাঁহারা এক গভীর অরণ্যমধ্যে আসিয়া পৌছিলেন। সেই অরণ্যের পরই থড়া। মধ্যে কেবল অর্দ্ধক্রোশ মাত্র ব্যবধান।



পৃথারায়, তারাদেবী ও শঙ্কর

সেই গভীর অরণ্যেই পৃথ্বীরায় সেদিনকার মত শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পৃথ্বীরায় ভাবিলেন, কাল মুসলমানদিগের মহরম। সেই দিনই তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া চকিত, ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন। কিন্তু সে বড় ভয়ঙ্কর দিন। সে দিন প্রত্যেক মুসলমান উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায়, ধর্ম্মপ্রণোদিত হৃদয়োচ্ছ্বাসে প্রজ্বলিত। প্রত্যেকেই যেন কালান্তক যমরূপে অবতীর্ণ। কিন্তু পৃথ্বীরায় এই দিনই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন, স্থির করিলেন।

আজ মহরম—মুসলমানের পর্ব্ব দিন। আজ থড়ায় বড় ধূম লাগিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার প্রারম্ভেই তিনজন অশ্বারোহী দুর্গাভিমুখে চলিয়াছেন। ইহারা—পৃথ্বীরায়, তারাদেবী ও শঙ্কর। শঙ্কর পৃথ্বীরায়ের বাল্যবন্ধু। শৈশব হইতে পরস্পর পরস্পরকে আপন সহোদরের ন্যায় দেখিয়া আসিতেছেন। তিন জনে অতি সন্তর্পণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই সৈন্যগণকে সতর্কভাবে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এখন তাহারাও ক্রমে ক্রমে দুর্গের পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারও মুখে একটী কথা নাই।

সকলেই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ,—যেন পাষাণের এক একটি প্রতিমূর্ত্তি অনেক দিন হইতে এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই সময় দুর্গের অভ্যন্তরের অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। পৃথ্বীরায়, তারাদেবী ও শঙ্কর এখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্তে রাশি রাশি দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। চতুর্দ্দিকে রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। আর্ত্ত-নাদের করুণ স্বরে দিক পূরিত হইয়া উঠিল। অসতর্ক মুসলমান উপায় নাই দেখিয়া যে যেদিকে পারিল, সেইদিকে ছুটিল। তখনই দামামা বাজিয়া উঠিল। দুর্গের দ্বার অবরুদ্ধ হইল।

পৃথ্বীরায় এইরূপই আশা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যদি তিনি সসৈন্যে দুর্গ আক্রমণ করেন, তাহা হইলে কখনই এত সত্বর কার্য্যোদ্ধার হইবে না। মুসলমানগণ অশ্বের হ্রেষা শুনিলেই দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে—তারপর দলে দলে তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িবে। এই জন্যই তিনি সৈন্যগণকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়া-ছিলেন। যখন তাঁহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহাদিগের উপরই সকলের চক্ষু

পড়িল,—বাহিরের কোন বিষয়ে দৃষ্টি রহিল না। এই সময় পৃথ্বীরায় দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজপুত সৈন্যগণ দলে দলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য একবারমাত্র চেষ্টা করিল, কিন্তু সে বৃথা। মুষ্টিমেয় রাজপুতের কাছে আজ অসংখ্য মুসলমান সৈন্যের বিজয়-গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তারাদেবী পৃথ্বীরায়ের পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আজ যেন তারা আর সে তারা নহে। যেন কোন দৈবশক্তি তারার কোমল হৃদয়কে নাচাইয়া তুলিয়াছে। তারা আজ রণচণ্ডী সাজিয়া দুই হস্তে শত্রু-নিধনে ব্যস্ত। সন্ধ্যার মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইল। রাজপুতের আজ আর উল্লাসের সীমা নাই। মুসলমানের রাশি রাশি মৃত দেহ যুদ্ধের পরিণাম জানাইল। থড়া আবার স্বাধীন হইল।

তাহার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই তারার সহিত পৃথ্বীরায়ের বিবাহ হইয়া গেল। রতন সিংহ আবার স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই পৃথ্বীরায়কে রাজ্যভার দিয়া বিদনরে চলিয়া গেলেন। এইরূপে অতি সুখে দুই বৎসর কাটিয়া

গেল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ বুঝি নিয়তি মানবের ভাগ্যে লিখে নাই; তাই এই সুখের উন্মেষ হইতে না হইতেই পৃথ্বীরায়ের জীবন-নাট্যে যবনিকা পড়িল।

৩

পৃথ্বীরায় যখন দ্বাবিংশতি বৎসর মাত্র অতিক্রম করিয়াছেন এবং তারা প্রথম যৌবনে অনুপম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ললিত রাগে বিকশিতা হইয়া উঠিয়াছেন,—এমন সুখের দিনে সহসা প্রলয়ের মেঘ উঠিল।

পৃথ্বীরায়ের এক ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণা। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই যুবকের নৈতিক চরিত্র তেমন ভাল ছিল না। কৃষ্ণা এই চরিত্রহীন যুবকের সহবাসে একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। অত্যাচার দিনে দিনে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে নিরুপায় চিত্তে কৃষ্ণা পৃথ্বীরায়ের শরণ লইলেন, অতি গোপনে একখানি পত্র

লিখিয়া পৃথ্বীরায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পৃথ্বীরায় যে দিন এই পত্র পাইলেন, সেইদিনই কৃষ্ণাকে রক্ষা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। উদ্ধত যুবককে অনেক ভৎ র্সনা করিলেন। এমন কি স্বপত্নীর ব্যবহৃত পাদুকা মস্তকে করাইয়া তাহার পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাইলেন; কিন্তু এই অপমান যুবকের হৃদয়ে আঘাত করিল। প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মনে মনে সে এক ষড়যন্ত্র করিল। মনের ভাব মনে চাপিয়া সে পৃথ্বীরায়কে উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করিল না। সে দিন এক মহাভোজের আয়োজন হইল। সরল প্রকৃতি পৃথ্বীরায় জানিতেন না যে, এই আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনের বিরুদ্ধে এক মহা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে।

ভোজের সময় সরবতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই সরবত পৃথ্বীরায় পান করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাঁহার মুখের জ্যোতি ক্রমশঃ নিভিয়া আসিল। অচেতন অবস্থায় তিনি ভূতলে

পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে সংবাদ ছুটিল। তারাদেবী সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। বৃদ্ধ পিতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হায়! সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—পৃথ্বীকে আর রক্ষা করা গেল না। চিতোরের অধিবাসিগণকে কাঁদাইয়া, তারার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পৃথ্বীর জীবন-দীপ চিরনির্ব্বাণ লাভ করিল।

তখন সতীদাহ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। তারাদেবী ইহকালে পৃথ্বীরায়ের সঙ্গিনী ছিলেন,—পরকালেও সঙ্গিনী হইতে চলিলেন। মহারাণা, রতন সিংহ প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন, এমন কি সমুদয় চিতোরবাসী তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিবার জন্য কত চেষ্টা করিল, কত অনুরোধ করিল, কিন্তু তারাদেবী আপন কর্ত্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

চিতা সজ্জিত হইল। ধীরে ধীরে পৃথ্বীরায়ের মৃতদেহ তাহার উপর স্থাপন করা হইল। তারার চিত্তে আর কোন বেদনা নাই। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে শোকের যে প্রবল তুফান উঠিয়াছিল,

সহসা তাহা প্রশমিত হইয়া আনন্দের স্রোত ছুটিল। ব্রাহ্মণগণ পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তারা ধীরে ধীরে আসিয়া চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। জন্মের শোধ স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইলেন। তাহার পর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের সহিত চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর সহগামিনী হইলেন। চিতা সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। দামামা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যে দিক নিনাদিত হইল। কিন্তু তারাদেবীর কোমল দেহ নিশ্চল, নিস্পন্দ—চিতা প্রজ্জ্বলিত হইবার বহু পূর্ব্বেই যেন তাঁহার জীবন অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

নিমেষে সব শেষ হইল। পৃথ্বী ও তারার কমনীয় কান্তি ভস্মে পরিণত হইল। দেশের লোক সে ভস্ম মাথায় ধরিয়া বীরত্ব ও প্রেমের দিব্য স্মৃতি লইয়া গৃহে ফিরিল।

ধাত্রী পান্না।

মেবারের মহারাণা সংগ্রামসিংহ এক সময় সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। নিয়তি-চক্রে হীনবংশীয় এক যুবকের কৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যে তিনি এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সামান্য দাস হইতে ক্রমশঃ উচ্চপদস্থ রাজমন্ত্রীর পদেও তাহাকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই যুবকের নাম বনবীর। রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বনবীরের জন্মসিদ্ধ হীন-প্রকৃতি একবারে নষ্ট হয় নাই—উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল মাত্র। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাণার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি এই সর্পধর্ম্মী খলের হস্তে তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্র উদয়সিংহের অভিভাবকত্ব অর্পণ করিয়া যাইলেন। উদয়সিংহের বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র।

পান্না মেবারের রাজান্তঃপুরের পুরাতন ধাত্রী। শুধু পান্না কেন? তাহারা তিন পুরুষ ধরিয়া

মহারাণার অন্নেই প্রতিপালিত। এই জন্যই—দাসী ও প্রভু—এই উভয় বংশের মধ্যে বেশ একটি ঐকান্তিক হৃদ্যতা ও সহানুভূতি আপনা হইতেই জন্মিয়াছিল। পিতৃমাতৃহীন বালক উদয়সিংহ এই ধাত্রী পান্নার হস্তেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। আপন পুত্র অপেক্ষাও পান্না তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিত। এই রাজকুমারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে আপন স্নেহের পুত্রকেও বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

খলের স্বভাব এমনই যে, সুযোগ পাইলেই তাহা বিষ উদ্গীরণ করে। বনবীর এইবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। অতি হীন দাসী-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ-অনুগ্রহে এক্ষণে একরূপ সমগ্র মেবার রাজ্যের অধিপতি হইয়াও তাহার আশার নিবৃত্তি হইল না; সিংহাসন-লাভের জন্য ঔৎসুক্য জন্মিল। কিন্তু সে পথে এক ভীষণ বাধা—কুমার উদয় সিংহ।

কুমার উদয় সিংহ জীবিত থাকিতে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে। বনবীর অবশেষে কুমারকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু কাহাকে এ বিষম কার্য্যের ভার অর্পণ করিবে?

কাহারও সহিত তাহার সদ্ভাব নাই এবং সহসা কাহাকে বিশ্বাসও করা যায় না। বিশেষতঃ এ কথা একবার প্রকাশ পাইলে তাহার জীবন সংশয়! সমগ্র রাজপুত বীরের অসি এককালে তাহার বিরুদ্ধে ঝলসিয়া উঠিবে। অগত্যা বনবীর স্থির করিল, নিজহস্তে সে এ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য সম্পন্ন করিবে; পরে সভাসদ্বর্গকে একবার সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সিংহাসন-লাভের পক্ষে আর কোন অন্তরায় থাকিবে না।

বনবীরের এ পাপ সঙ্কল্প সাধারণে অপ্রকাশ থাকিলেও একজন তাহা জানিতে পারিয়াছিল—সে চন্দ্রধর। পান্নার ন্যায় তাহারও পিতৃ-পিতামহগণ রাজপরিবারে পুরুষানুক্রমে দাসত্ব করিয়াছে। আজ তাহার কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ সে আপন জীবন-বিনিময়েও রাজকুমারের প্রাণরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইল।

রজনীর অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া নামিতেছিল। পান্না রাজকুমার এবং নিজ পুত্রকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একবার তাহার তন্দ্রাও আসিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ—পাতাটি নড়িলে শুনা যায়।

এমন সময় কাহার পদশব্দ শুনা গেল। পান্না ত্বরিতে দ্বার খুলিয়া দেখিল—রাজবাটীর বৃদ্ধ ভৃত্য ব্যস্তভাবে তাহারই নিকট আসিতেছে। পান্না জিজ্ঞাসা করিল, "চন্দ্রধর, সংবাদ কি?"

"সংবাদ বড় মন্দ। রাজকুমারের জীবন-সংশয়। বিশ্বাসঘাতক বনবীর, বোধ হয়, সত্বরই কুমারের জীবন-নাশের জন্য এখানে আসিবে। আমি এই সংবাদ পাইয়াই তোমার নিকট আসিতেছি। এখন উপায় কি?"

"আমি যাহা ভয় করিয়াছিলাম, দেখিতেছি, তাহাই হইতে চলিল। কিন্তু যে কোন উপায়ে হউক, স্বর্গীয় মহারাণার একমাত্র বংশধরকে রক্ষা করিতে হইবেই।" পান্না কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, "দেখ, চন্দ্রধর, রাজকুমারকে এই মুহূর্ত্তেই স্থানান্তরিত করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতেছি না। তুমি ইহাঁর জীবন রক্ষা কর।"

"এ যুক্তি মন্দ নয়, কিন্তু আজ বড় ভয়ঙ্কর দিন। চতুর্দ্দিকেই অতি সতর্ক কঠিন পাহারা। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন প্রাণীর রাজবাটী হইতে বাহির হইবার উপায় নাই।"

"আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। তুমি ঐ ঝুড়িটিতে কুমারকে রাখিয়া উপরে কিছু জঞ্জাল চাপাইয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে আর কেহই তোমায় সন্দেহ করিবে না।" ইহা বলিয়া পান্না তাহার পরিচিত এক জৈন সদাগরের গৃহে কুমারকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে তাহাকে উপদেশ দিল।

"স্বীকার করিলাম, কিন্তু যখন কুমারের সন্ধান না পাইয়া চারিদিকে লোক ছুটিবে, সে সময়ের উপায় ?"

"সে উপায়ও আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি। বনবীর জানিবেন না যে রাজকুমারকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আমি ইতিমধ্যে আমার পুত্রকে কুমারের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া রাজ শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিব। ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে ? আমার বড় স্নেহের পুত্র, যদি ইহার জীবনের বিনিময়েও মেবার রাজবংশের ভবিষ্যৎ গৌরব রাজ-কুমারকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেও আমার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব।"

চন্দ্রধর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

পান্না ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই ঝুড়ি লইয়া আসিল। ধীরে ধীরে রাজকুমারকে তাহাতে রক্ষা করিয়া কতকগুলি আবর্জ্জনায় ঝুড়িটি পূর্ণ করিয়া দিল। চন্দ্রধর নির্ব্বাকভাবে পান্নার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। পান্না বলিল "চন্দ্রধর, আর বিলম্ব করিও না। সত্বর রাজকুমারকে লইয়া চলিয়া যাও।"

"কিন্তু, পান্না, তুমি এ কি করিতেছ—জননী হইয়া ঘাতক হস্তে নিজ পুত্রের জীবন উৎসর্গ ?"

"আমি আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। তুমি আর বিলম্ব করিও না।"

চন্দ্রধর চলিয়া গেল। পান্না আপন পুত্রকে রাজ-শয্যায় শয়ন করাইয়া ঘাতকের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। সহসা আবার সেই পদ-শব্দ। পান্না ভয় বিহ্বল চিত্তে চাহিয়া দেখিল, দ্বারে বনবীর দণ্ডায়-মান। পান্না উঠিয়া দাঁড়াইল। "পান্না, রাজকুমার কেমন আছেন ? শারীরিক ভাল ত ?" এই বলিয়া বিশ্বাসঘাতক বনবীর কুমারের শয্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কাহিনী। .

পান্নার হৃদয় তখন কাঁপিয়া উঠিল। বনবীর কয়েক মুহূর্ত্ত কুমারের শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর সহসা বস্ত্রমধ্য হইতে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া শিশুর কোমল অঙ্গে বসাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ একটি করুণ চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়া সমগ্র রাজপ্রাসাদ সচকিত করিয়া তুলিল। বনবীর আত্মরক্ষার জন্য ত্বরিত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অল্পকাল মধ্যেই চারিদিক হইতে অনেকে পান্নার গৃহাভিমুখে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ের রক্ত—ভয়ে ও বিস্ময়ে—যেন হিম হইয়া আসিল। তাহারা দেখিল, শিশুর তরল রক্তে গৃহ প্লাবিত—পান্না মূর্চ্ছিতা। বহু কষ্টে পান্নার জ্ঞান হইলে, সকলে তাহাকে, জিজ্ঞাসা করিল "কে রাজকুমারকে হত্যা করিল?" পান্না তৎকালে প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া সংক্ষেপে বলিল, "এক ভীষণ-আকার দস্যু সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রাজকুমারকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল, কিছুই জানি না।"

সকলে ভাবিল, রাজকুমারই হত হইয়াছেন! পান্না তৎপরে রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া উদয় সিংহের পরিচর্য্যার নিমিত্ত পূর্ব্বকথিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মিলিত হইল।

তাহারি' পর, উদয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন মেবার সিংহাসন অধিকার করিলেন, বনবীর তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতার চূড়ান্ত প্রতিফল পাইল। আর পান্না রাজমাতার ন্যায় আজীবন রাজগৃহে পূজা ও সম্মান লাভে বঞ্চিতা হন নাই—মৃত্যুর পরও,—সে আজ কত শত যুগ চলিয়া গিয়াছে—ভক্তি ও শ্রদ্ধার সগৌরব স্মৃতিতে মণ্ডিত হইয়া পান্নার নাম এ কালের নরনারীর চিত্তেও অমর অক্ষরে প্রতিফলিত রহিয়াছে। তাহার পুণ্য কাহিনীর অমল দীপ্তিতে সারা গগন আজ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে—সে স্মৃতি কখনও মুছিবে না, সে দীপ্তি কখনও নিভিবে না।

গণোর রাজমহিষী।

১

মধ্যভারতে গণোর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন ছোট বড় হিন্দুরাজ্যগুলি একে একে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া হিন্দুর বাহুবল কলঙ্কিত করিতেছিল, সেই সময়ে গণোর ক্ষুদ্র হইলেও আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টায় ত্রুটি করে নাই। মোগল কর্ত্তৃক পরাভূত পাঠানেরাও তৎকালে রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে বিতাড়িত হইয়া ফিরিতেছিল, তাহা-রাও এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া এই সকল হিন্দুরাজ্যের উপর অশেষ প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। কোথাও বা লুণ্ঠনে, কোথাও বা নিরীহের প্রতি অযথা অত্যাচারে তাহারা আপনা-দিগের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল। যে সকল পাঠান—সুবাদার বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারাও অনন্যোপায় হইয়া এই সুযোগে

দুই একটি নিরীহ হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এইরূপে বিতাড়িত এক পাঠান সেনাপতির দৃষ্টি গণোর রাজ্যের উপর পড়িল। তিনি সদলবলে গণোর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। গণোর-রাজ তাঁহার নির্ব্বাচিত কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া পাঠানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। হিন্দু মুসলমানে ঘোর সংগ্রাম বাধিল—কয়েক দিবস-ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর বিজয় লক্ষ্মী অবশেষে মুসলমান সেনাপতিরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। গণোর-রাজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন।

এই সংবাদ যখন গণোর রাজমহিষীর নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি এই আসন্ন বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অকাতরে স্বামী-শোক সম্বরণ করিলেন এবং স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্যের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতায় অনেক হিন্দু তাঁহার পক্ষে আসিয়া যোগদান করিল।

সেই সকল সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি স্বয়ং

পাঠান সেনাপতির সম্মুখীন হইলেন। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অক্লান্ত পরিশ্রমে হিন্দু সৈন্য মুসলমান-দিগের সহিত সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অসংখ্য পাঠান হত ও আহত হইয়া হিন্দুর বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিল।

এইরূপে পর পর পাঁচটি দুর্গ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি অবশিষ্ট সৈন্য সমেত নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী তাঁহাদিগের প্রধান দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহাদিগের প্রতিকূলে। সবেমাত্র তিনি নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন—বহু সৈন্য তখনও নর্ম্মদা বক্ষে, —এমন সময় উন্মত্ত পাঠানেরা সুযোগ বুঝিয়া সহসা দুর্গ আক্রমণ করিল। রাণী নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। পাঠানেরা প্রথমেই দুর্গের বহির্ভাগে পরিত্যক্ত সৈন্যের উপর নিতান্ত নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করিল। অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুর তপ্ত-রক্তে নর্ম্মদা-বক্ষ রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

দুর্গের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া শত সহস্র পাঠান প্রাচীরগাত্রে মই লাগাইয়া দুর্গমধ্যে লাফাইয়া পড়িতে

লাগিল। রাণীর সহিত কয়েক সহস্রমাত্র রক্ষী দুর্গে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাহারা রাণীর পশ্চাতে থাকিয়া একবার শেষ রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু হায়, সব বৃথা! সে অসংখ্য পাঠান সৈন্যের নিকট মুষ্টিমেয় হিন্দু সৈন্য কি করিবে? রাণীর সৈন্যসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। জয়ের আশা একবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তথাপি হিন্দুদিগের যুদ্ধের অবসান নাই। রাণী অগত্যা নিরুপায় হইয়া পাঠানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

২

পাঠান-সেনাপতি রাণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ ছিল, গণোর-রাজমহিষীকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে। এখন তাঁহাকে স্বয়ং বশ্যতা স্বীকার করিতে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন; একজন বিশ্বস্ত পাঠান দূত দ্বারা রাণীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। 'আমি আপনার বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ

কাহিনী।

বীরত্ব গণোর-রাজমহিষীরই উপযুক্ত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সেইরূপ নবাব-মহিষী-রূপে সমগ্র গণোর-রাজ্য এবং এ গোলামের উপর প্রভুত্ব করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।'

পত্র পাঠ করিয়া রাণী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি হিন্দু রমণী, মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু যতদিন এই দুর্ব্বৃত্ত পাঠান তাহার পাপ অভিলাষের উপযুক্ত শাস্তি না পাইতেছে, ততদিন মৃত্যুতেও আমার শান্তি নাই। এখন তাহার নীচ প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলে কামোন্মত্ত পাঠান আমার উপর বল প্রয়োগে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতেছি না।' ভাবিয়া সেই পাঠান দূতের মুখেই তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার প্রভুকে বলিও আমি তাঁহার সৌজন্যে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তিনি আমাকে দয়া করিয়া পত্নীত্বে বরণ করিলে, তাহা বিশেষ শ্লাঘ্য মনে করিব। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। আমাদের বংশের চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে বিবাহাদি উৎসবে একটি উচ্চ মঞ্চ

নির্ম্মাণ করাইতে হয়। এই মঞ্চ-নির্ম্মাণে যে সময়ের প্রয়োজন, তৎকাল অবধি তিনি যেন আমায় সময় দান করেন।'

বলা বাহুল্য, রাণীর প্রার্থনা তখনই মঞ্জুর হইল। ইতিমধ্যেই রাণী একটি বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ পাঠান-সেনাপতিকে উপহার পাঠাইলেন। সেনাপতি হিন্দু রমণীর ভালবাসার প্রথম নিদর্শন পাইয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া পড়িলেন। কত সুখের কল্পনাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।

যথা সময়ে প্রাসাদের এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মঞ্চ নির্ম্মিত হইল। স্তূপীকৃত বারুদের রাশি,—তাহার উপর কিংখাপের শয্যা রচিত। রাণী একটি মখমলের আসনে উপবিষ্টা এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সহচরিগণ সুন্দর বেশে সজ্জিতা হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি মশাল।

পাঠান-রাজ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। আজ আর তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার সহিত সমুদয় পাঠান সৈন্যও আনন্দে উন্মত্ত। নৃত্যে, গীতে, আনন্দে, শোভায় সমুদয় গণোর-রাজ্য এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যা-সমাগমেই

সেনাপতি ভাবী পত্নীর প্রথম দান সেই অপরূপ পরিচ্ছদটি পরিধান করিয়া গণোর প্রাসাদে পত্নী সম্ভাষণে চলিলেন—পশ্চাতে তাঁহার অসংখ্য অনুচর। সেনাপতি প্রাসাদের সম্মুখীন হইলে, রাণী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঞ্চের নিকট লইয়া যাইলেন। তথায় তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া পরস্পর বাক্যালাপে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পাঠান-সেনাপতি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে মৃত্যু-চিহ্ন তাঁহার মুখমণ্ডলে স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল। বিকারের ঘোরে তিনি সেই মূল্যবান পোষাকটি খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। রাণী তখন হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'পাঠানরাজ! তুমি হিন্দু রমণীর সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলে, তাই তোমার এই শাস্তি। তোমার ন্যায় পিশাচের হস্ত হইতে উদ্ধার-লাভ জন্য বিষাক্ত পোষাক তোমায় উপহার পাঠান হইয়াছিল,—আজ আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।' এই কথা বলিয়া রাণী চকিতের মধ্যে প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়া নর্ম্মদার স্ফীত বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

পাঠান সেনাপতির মৃত্যু-কাহিনী চারিদিকে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দৃপ্ত পাঠান সৈন্যেরা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া রাণীর উদ্দেশে ধাবিত হইল। কিন্তু কোথায় রাণী! সম্মুখে রাণীর সহচরিবৃন্দকে দেখিতে পাইয়া সৈন্যগণ তাহাদিগকেই আক্রমণ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই মঞ্চ বারুদপূর্ণ ছিল। এক্ষণে তাহারা হাসিতে হাসিতে সেই বারুদে মশালের আগুণ ধরাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে ভীষণ শব্দে রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তাহার পর সকলই নীরব।

পরদিন বহু কষ্টে পাঠান সেনাপতির অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ রাজপ্রাসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া ভূপালের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে তাহা সমাহিত করা হয়। অদ্যাবধি সে সমাধিমন্দির সেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাণী দুর্গাবতী।

১

গড়মণ্ডল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, মধ্য ভারতে অবস্থিত। সম্রাট আকবরের প্রবল প্রতাপে ভারতের অনেক ভূপতি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেও গড়মণ্ডল তখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে আপন শাসন বিস্তার করিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় ছিল, সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি, একজন রমণী।

দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের রাণী। তিনি কনৌজরাজ চন্দনসিংহের কন্যা। দুর্গাবতী অসামান্যা রূপসী ছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল, কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুত নৃপতির সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু দুর্গাবতী আর একজনকে ভাল বাসিয়াছিলেন—তিনি এই গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপত সা। দুর্গাবতী তাঁহাকে পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে লিখিলেন। চন্দনসিং এ বিবাহে সম্মত হইলেন না। মণ্ডল-অধিপতি

ইহাতে অপমান বোধ করিয়া কনৌজ আক্রমণ এবং চন্দনসিংকে পরাস্ত করিয়া দুর্গাবতীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কয়েক বৎসর সুখেই অতিবাহিত হইল। দুর্গাবতীর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রের জন্মোৎসবে গড়মণ্ডলের ঘরে ঘরে আনন্দের উৎস ছুটিল। পুত্রের নাম রাখা হইল—বীর নারায়ণ। সুখ দুঃখের আবর্ত্তন চক্রনেমিরই মত—চিরদিন কাহারও অদৃষ্টে সুখভোগ ঘটে না। সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দলপত সা একদিন অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

সেই গভীর শোক এবং দুঃখের মধ্যেই শিশু পুত্রের অভিভাবকরূপে রাণী দুর্গাবতীকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। অবসরের মুহূর্ত্তগুলি দারুণ শোকে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিলেও কর্ত্তব্য-সাধনকালে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকিত না। সে সময় তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন। রমণী হই-লেও রাজকার্য্য-পরিচালনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রম ও যত্নের কাহিনীতে ইতিহাসের

পৃষ্ঠা আজ সমুজ্জ্বল, এবং এই দেশের জন্যই অকাতরে আপনার শরীর প্রাণ উৎসর্গ করিতে তিনি কাতর হন নাই।

বাদশাহ আকবরের অধীনস্থ মধ্য ভারতের শাসনকর্তৃগণ বার বার গড়মণ্ডল অধিকারের জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আকবর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণীর বীরত্বের কাহিনী শুনিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের তিনি মাতৃস্বরূপিনী। দেশের হিতের জন্য অকাতরে তিনি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—পুষ্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির স্থাপন প্রভৃতি অসংখ্য কীর্ত্তি এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। গড়মণ্ডল ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও, সুশাসনে প্রজার সুখের সীমা ছিল না—দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকায় কলা-শিল্পেরও সমধিক উন্নতি হইয়াছিল।

আকবর বার বার প্রতিনিধিবর্গের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেও মধ্য ভারতের অন্যতম শাসনকর্ত্তা আশফ খাঁর যুক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। আশফ খাঁর অধীনে একদল সৈন্য

গড়মণ্ডল অভিমুখে প্রেরিত হইল। দুর্গাবতী কখনই প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের সমকক্ষ হইতে পারেন না। বাদশাহ ইচ্ছা করিলে বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন। দুর্গাবতীর পক্ষে দেশরক্ষার আশা দুরাশা মাত্র তথাপি তিনি একবারে নিরাশ হইলেন না—হয় রাজ্যরক্ষা, না হয় জীবন বিসর্জ্জন—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

২

সমগ্র গড়মণ্ডল হইতে অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী এবং দ্বিসহস্র হস্তি সংগৃহীত হইল। গড়মণ্ডলের সকল বীর বীরনারীর অধিনায়কতায় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। রণরঙ্গিণী রমণীর উৎসাহ দেখিয়া বীরহৃদয়ের উৎসাহ সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল—দুর্ব্বলের প্রাণেও শক্তি সঞ্চারিত হইল।

আশফ খাঁ নিমেষের জন্যও ভাবেন নাই যে সামান্য গড়মণ্ডল হইতে এত সৈন্য সংগৃহীত হইতে

কাহিনী।

পারে! আবার সে সৈন্যগণের হৃদয় অটল, ভীতিকম্পিত নহে! তিনি ভাবিয়াছিলেন, গড়-মণ্ডলের ন্যায় সামান্য রাজ্য অধিকার করিতে গুরু আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। তাই তিনি পঞ্চ সহস্র মাত্র অশ্বারোহী লইয়া গড় আক্রমণে আসিয়াছিলেন। এখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। যাঁহাকে তিনি সামান্যা রমণী ভাবিয়াছিলেন তিনি অসামান্যা বীরবালা। সেনাপতি দেখিলেন, এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা শুধু বল ক্ষয় করা মাত্র, তথাপি তিনি ফিরিতে পারিলেন না,—অন্তত মোগল সম্রাটের সম্মান রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করিতে হইবে।

উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিল। সেই যুদ্ধে রাজসৈন্য শোচনীয় ভাবে পরাস্ত ও নিহত হইল। আশফ খাঁ অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গড়মণ্ডলে আনন্দের জয়ধ্বনি উঠিল। কিন্তু দুর্গাবতীর মনে এক তিলও আনন্দ দেখা দিল না, কারণ তিনি জানিতেন, মোগল সম্রাট যখন গড় অধিকারে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন সহজে নিরস্ত হইবেন না। এবার গভীর আক্রোশে সম্রাটের

বিপুল বাহিনী গড়মণ্ডলের গিরিবর্ত্ম ছাইয়া ফেলিবে। দুর্গাবতী যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতে আশফ খাঁ পুনরায় গড় আক্রমণ করিলেন। এবার তাঁহার সৈন্যদল অসংখ্য! মোগলের জয়পতাকা উড়াইবার জন্য আয়োজন এবার চূড়ান্ত হইয়াছিল।

দুর্গাবতী জীবন পণ করিয়া রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্রতী হইলেন। দেহে প্রাণ থাকিতে কাহাকেও তিনি তাঁহার সাধের গড় অধিকার করিতে দিবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি এবারও বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। এবারও বিজয় লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। আশফ খাঁ পরাস্ত হইয়া শৃগালের মত পলায়ন করিলেন।

আশফ খাঁ দেখিলেন, সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার কোন আশা নাই। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে স্থির করিয়া তিনি কয়েকটি গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। উৎকোচ-দানে মণ্ডল সৈন্যগণকে পক্ষভুক্ত করিবার সকল চেষ্টাই তাহাদিগের ব্যর্থ হইল। তাহাতে সুবিধা হইল না। তখন তাহারা



গৃহবিবাদের বীজবপনে রত হইল। আশার গাছে ফল ধরিতে বিলম্ব হইল না। পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সঞ্চারিত হইল। সুযোগ বুঝিয়া মুসলমান সেনাপতি তখন তৃতীয় বার আসিয়া গড় আক্রমণ করিলেন। দুর্গাবতী দেখিলেন, এবার আর রক্ষা নাই। যখন আত্ম-কলহ গৃহ-বিচ্ছেদ আসিয়া দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তখন দেশের জন্য আর কাহারও প্রাণ কাঁদিবে না। দুর্গাবতী একবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন, তথাপি তিনি মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। তিনি তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, যে কয়েক সহস্র সৈন্য সাগ্রহে আসিল, তাহাদিগকে লইয়াই, যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। দুর্গাবতী দেখিলেন, তাঁহার স্নেহের পুত্র বীরনারায়ণ আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িলেন। তখনই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সংবাদ আসিল, মুমূর্ষু পুত্র মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে দেখিতে চাহে। রাণী বলিলেন,

'এখন আমার যাইবার সময় নাই। আমার অদর্শনে সৈন্যগণ ছত্র-ভঙ্গ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। যদি আমার পুত্রের মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে পরজগতে আবার আমরা শীঘ্রই মিলিত হইব।' মাতার হৃদয় একটুও কাঁপিল না ;—যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে বিপক্ষ দল হইতে একটি তীর সবেগে আসিয়া রাণীর চক্ষুতে আঘাত করিল। রাণী স্বহস্তে তাহা চক্ষু হইতে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্তি দিলেন না। তারপর ক্রমে তাঁহার সমুদয় সৈন্যই হত ও আহত হইয়া পড়িল। কেবল কয়েক শত মাত্র তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য তখনও পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল। রাণী দেখিলেন, আর রক্ষা নাই, বন্দী হইতে বিলম্ব নাই! কিন্তু বনের সিংহিনী বন্দিনী হইবে? না, কখনও না! তবে উপায়? মুহূর্ত্তের জন্য তিনি একবার যুদ্ধক্ষেত্রের পরিণাম কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিলেন—তাঁহার সাধের গড়ের কি দশা হইবে ভাবিয়া কাতর হইলেন। কিন্তু আর ভাবিবারও সময় নাই। ঐ মুসলমানের বিজয়-উল্লাস! ঐ তাহাদিগের রণোন্মাদ

হুঙ্কার! আর নহে! আর আশা নাই। স্বহস্তে রাণী আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

তাঁহার এক বিশ্বস্ত সৈনিক সে পবিত্র মৃতদেহ রণস্থল হইতে লইয়া আসিয়া তাহার যথারীতি সৎকার করিয়া শত্রুর রুদ্র হস্তের স্পর্শ-কালিমা হইতে রক্ষা করিল।

যোধপুর রাণী।

সাজাহানের রাজত্বকালে যোধপুর-অধিপতি যশোবন্ত সিংহ প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঔরঙ্গজেব যখন বিদ্রোহের নিশান তুলিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় রাজা যশোবন্ত সিংহ কয়েক সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ঔরঙ্গজেবের পথ রোধ করিতে অগ্রসর হন। নর্ম্মদার সন্নিকটে এক যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই দশ সহস্র মোগল সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। যশোবন্ত সিংহ পরাস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে এক গুরু-চিন্তা বার বার উদয় হইয়া তাঁহাকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। কেমন করিয়া তিনি রাণীর নিকট মুখ দেখাইবেন? হয় ত তিনি এতক্ষণে তাঁহার পরাভব-সংবাদ পাইয়াছেন। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে রাজা রাজধানী-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কাহিনী।

রাণী শুনিলেন, তাঁহার স্বামী যুদ্ধে পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কবিতেছেন। তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক বরং আদেশ দিলেন, দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিতে, যেন জনপ্রাণীও দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

'আমার স্বামী ভীরু, কাপুরুষ?—যোধপুরের অধিপতি, মেবারের মহারাণার জামাতা আজ এত-দূর হীন? কখনই না। আমার স্বামী নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন। এ ব্যক্তি হয় কোন ছদ্মবেশী পাপিষ্ঠ, না হয় তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি। ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ কিসের?' এই বলিয়া রাণী মনের খেয়ালে কল্পিত মৃত স্বামীর সহগামিনী হইবার জন্য চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন।

আট দশ দিবস অতীত হইলে রাণীর মনোভাব অনেকটা প্রশমিত হইল। তিনি রাজাকে দেখি-বার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তখন দ্বার উন্মুক্ত হইল। রাজা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাণী স্বয়ং তাঁহার আহত স্থান ধৌত করিয়া দিলেন।

ঔরঙ্গজেব দিল্লীর রাজতক্তে উপবেশন করিয়াই যশোবন্তকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন,

কারণ সমগ্র রাজস্থানের মধ্যে একমাত্র যশোবন্তকেই তিনি ভয় করিতেন। কাবুলের শাসনকর্ত্তা অনেক দিন হইতেই বিদ্রোহের নিশান তুলিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব রাজা যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। অভিপ্রায়, শত্রু-দমন—হয় আফগানদিগকে বশীভূত করুন, না হয় অসভ্য বর্ব্বর আফগানের হস্তে রাজার মৃত্যু হউক।

রাজা যশোবন্ত সম্মানের সহিত সে পদ গ্রহণ করিলেন। সম্মানের হইলেও সে পদে বিপদের সম্ভাবনাই সমধিক। রাণীও তাঁহার সহগামিনী হইবার জন্য অভিলাষিণী হইলেন। তাঁহারা উভয়ে পুত্র পৃথ্বী সিংহের উপর রাজ্য ভার দিয়া এক বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ আফগানদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

রাণী রমণী হইলেও বীরজায়া। তিনি সামান্য সৈনিকের ন্যায়ই স্বামীর পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। সৈনিক-জীবনের সকল কষ্ট সহ্য করিতে অনভ্যস্ত হইলেও স্বামীর পার্শ্বে থাকায় তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। এইরূপে অনেক দিন ধরিয়া বহু কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়া কত

পাহাড় পর্ব্বত মাঠ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কাবুলে আসিয়া পৌছিলেন। যশোবন্ত সিংহ দেখিলেন, সমুদয় রাজ্য দুর্গে ছাইয়া গিয়াছে। রাজপুত-বীরগণের কষ্টের আর সীমা নাই। একে চারিদিকেই বরফ—অবিশ্রাম তুষারপাত, তাহার উপর আবার সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান—অসভ্য বর্ব্বরগণ তাহার অধিবাসী। এত কষ্টেও যোধপুর-রাণা স্বামীর পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া অসীম সাহসে শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহার অসীম বীরত্ব দেখিয়া রাজপুত বীরগণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কিন্তু, হায়! যশোবন্তের জীবন-নাট্য এইখানেই শেষ হইল। তাঁহার পুত্র পৃথ্বীসিংহ বিশেষ সম্মানের সহিত দিল্লী সম্রাট কর্ত্তৃক আহূত হইলেন, কিন্তু তিনিও অল্পদিনের মধ্যে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব গোপনে বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। শয়তান ঔরঙ্গজেব জানিতেন, যশোবন্ত কখনই অসভ্য আফগানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন না, এখন তাঁহার পুত্র যদি পিতৃশোকে

অন্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাই তাঁহাকেও ধরাপৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া দিলেন।

যশোবন্তের মৃত্যুর পর পার্ব্বত্যময় আফগান রাজ্যে রাণীর অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তিনি হিন্দু রমণী, স্বচ্ছন্দে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিতে পারিতেন, কিন্তু বিধি বাদী। তাহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। রাণী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি রাজপুত-সৈন্যের অধিনেত্রী হইয়া স্বরাজ্য অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই কাবুল নগরীতে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। কাজেই আরও মাসাধিক কাল সেখানে অতিবাহিত করিয়া সকলে ভারতবর্ষে ফিরিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী এবং তাঁহার অনুচরবর্গের ইচ্ছা, একবারে যোধপুরে আসেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহাদের পথ অবরোধ করিলেন। তিনি শিশু পুত্রকে চাহেন। রাণী দৃঢ়তার সহিত রাজ-আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সমস্ত রাজপুত সৈন্য শিশু পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল।

কাহিনী।

একটি মিষ্টান্নের ঝুড়িতে শিশু পুত্রকে শয়ন করাইয়া কোন এক বিশ্বস্ত মুসলমান ভৃত্যের দ্বারা এক নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রভুভক্ত ভৃত্য তাঁহাদের আগমন পর্য্যন্ত কুমারকে লইয়া তথায় অপেক্ষা করিবে।

ভৃত্য কুমারকে লইয়া চলিয়া যাইবার পর রাজপুতগণ যুদ্ধশয্যায় সজ্জিত হইয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল—রাণী তাহাদের অধিনেত্রী। তিনিও যোদ্ধৃবেশে। পথে সম্রাটের সৈন্যের সহিত ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। বহু রাজপুত যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের ন্যায় প্রাণ দিল। তথাপি তাহারা বিরাম-হীন গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাণী ক্ষত-বিক্ষত শরীরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন। বহুক্ষণের পর হৃদয়ের ধনকে বুকে ধরিয়া অনেকটা শান্তি লাভ করিলেন।

রাণী তখন শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া তাঁহার ভ্রাতা মেবারের মহারাণার নিকট গমন করিয়া সবিস্তারে তাঁহার দুঃখ-কাহিনী নিবেদন করিলেন। তাঁহার ইতিহাস শুনিয়া অনেক রাজপুতেরই চক্ষু

ফুটিল। মহারাণা তাঁহার পুত্রের রক্ষণ-ভার গ্রহণ করিলেন।

তারপর রাণী যোধপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আজীবন মোগল রাজ্যের ধ্বংসের জন্য ঈশ্বরের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশাও পূর্ণ হইয়াছিল। জীবিত অবস্থাতেই তিনি মোগল রাজ্যের চরম পরিণতি দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

রাণী ভবানী

১

বাংলায় মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে দেশের আভ্যন্তরীন শাসনভার হিন্দু রাজদিগের উপরই অনেকটা নির্ভর করিত। তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্নও ছিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে মুর্শিদাবাদে রাজকর পাঠাইতে পারিলেই ভাবনা ছিল না, কিন্তু রাজকর পাঠাইতে অসমর্থ হইলেই নবাব ফৌজ পাঠাইয়া তাঁহাদিগের ধনাগার লুণ্ঠন করিতেন এবং প্রয়োজনমত শিক্ষাও দিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমান শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে ছিল। দিল্লীশ্বর নামে মাত্র সম্রাট। কাজেই বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ সুযোগ পাইয়া স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও আধিপত্য অধিক কাল স্থায়ী হইতে

পারিল না ;—করদাতৃ দেশীয় রাজাগণ স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল জ্বালিতে লাগিলেন।

বাংলার শেষ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র সিরাজদ্দৌলা নবাবের পদ গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দী বহু কষ্টে দেশীয় রাজদিগকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনের ভার এই হিন্দু রাজগণের উপরই ন্যস্ত ছিল। ইহাঁদিগের মধ্যে চারিজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ঢাকার রাজা রাজবল্লভ, পাটনার রাজা রায়দুর্ল্লভ, নাটোরের রাণী ভবানী। ইহাঁরা সকলেই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন এবং মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও দুইজনের নাম বাংলায় বিশেষ বিদিত—জগৎ শেঠ এবং নবাবের সেনাপতি মীর্জ্জাফর।

নাটোর রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সমগ্র প্রদেশের বাৎসরিক আয় প্রায় দেড় কোটি মুদ্রা। বাংলার নবাবকেও প্রায় ৫২ লক্ষ মুদ্রা রাজকর দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত সৈন্য রক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যয়ও ছিল। রাণীর অধীনে প্রায় ৫০ সহস্র

অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য থাকিত। রাণী ভবানীর স্বামীর নাম রাজা রামকান্ত। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি ঘোরতর বিলাস-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার প্রাচীন দেওয়ান দয়ারাম অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সৎপথে আনিতে পারিলেন না। রাণী ভবানী তখন অল্পবয়স্কা হইলেও বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন, নানা অনুনয় বিনয়,—কিছুতেই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। রামকান্ত দেখিলেন, বৃদ্ধ দয়ারামই তাঁহার পথের কণ্টক। তিনি কোন এক সামান্য কারণে তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন। তখন আর তাঁহার কোন বাধা রহিল না। অকাতরে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। অভিভাবকহীন যুবক সঙ্গদোষে যেরূপ হয় তাহাই হইলেন—দিন দিন অবনতির চরমে নামিতে লাগিলেন। রাজকার্য্য কিছুই পর্য্যালোচনা করিতেন না। সৈনিকগণ নিয়মিত তাহাদের বেতন পাইত না। ক্রমে ক্রমে রাজকরও বাকী পড়িতে লাগিল। একদিন নবাবের সৈন্য আসিয়া রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা রাজাকে

অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া অপর এক ব্যক্তিকে গদীতে বসাইল। রামকান্ত রাজ্যচ্যুত হইয়া রাণী ভবানীর সহিত জগৎ শেঠের গৃহে আশ্রয় লইলেন।

বিলাসিতা তাঁহাকে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। জীবনে কখনও তিনি দুঃখভোগ করেন নাই, এখন দুঃখের মুখ দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাণী তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। এখন হইতে তিনি রাণীর পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। ভবানী পুনরায় বৃদ্ধ দয়ারামকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কার সকল নবাবের রাজকর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া কোন উপায়ে পুনরায় তাঁহার স্বামীকে নাটোরের রাজগদীতে বসাইলেন। আবার আনন্দ ফিরিয়া আসিল।

এ সুখ ভবানীর অদৃষ্টে অধিক কাল স্থায়ী হইল না। তাঁহাকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া তাঁহার স্বামী পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার দুই পুত্রের শিশু অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিয়াছিল—এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম তারা। অদৃষ্ট দোষে তারাও বালবিধবা। রাণী ভবানীর যখন স্বামী-বিয়োগ হয়, তখন তাঁহার

কাহিনী।

বয়ঃক্রম সবে দ্বাত্রিংশ বর্ষ মাত্র। এই অল্প বয়সেই তাঁহার হস্তে নাটোরের বিস্তৃত রাজ্যভার পতিত হইল। কিন্তু তিনি এ কার্য্যে অনুপযুক্তা ছিলেন না। রাজকার্য্য-পরিচালনে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সময়েই স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিতেন।

২

রাণী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন, সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করা ব্যতীত যথেচ্ছাচারী নবাবের হস্ত হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রকৃতিতে তখন উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এত অর্থ কেবল রাজকর হইতে সঙ্কুলান হইয়া উঠিত না, কাজেই অসদুপায়েও তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইত। এ কারণে অত্যাচারের মাত্রাও অনেক বাড়িয়া গেল।

রাণী ভবানী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি

দেখিলেন, বাংলার রাজনৈতিক আকাশে শীঘ্রই এক তুমুল ঝড় উঠিবে। সেই ঝড়ে মুসলমান শক্তি চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া আবার বাংলায় হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। হিন্দু রাজগণ যদি এই সময়ে হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া একত্র মিলিত হন, তাহা হইলে বাংলা হিন্দুদেরই হইবার সম্ভাবনা। রাণী পূর্ব্ব হইতেই নিজেকে আসন্ন বিপদের নিমিত্ত প্রস্তুত রাখিবার জন্য সৈন্য সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠিক এই সময়ে এক অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইল।

রাণী ভবানীর বিধবা কন্যা তারা বাংলায় অতুলনীয়া সুন্দরী বলিয়া খ্যাতা। নবাবের কতিপয় অসৎ সহচর সিরাজের নিকট সবিস্তারে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিল। নবাব তাহাদের প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া যে কোন প্রকারে হউক, তারাদেবীকে আনিতে আদেশ করিলেন—যদি বল-প্রয়োগে প্রয়োজন হয়, তথাপিও। তাহাদের অভিপ্রায়ই ছিল, নবাবের সহায়তায় রাণীর ধনাগার লুণ্ঠন করা। এখন তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবারও দিব্য সুযোগ উপস্থিত হইল।

নবাবের অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ এক ব্যক্তিকে

নাটোরে প্রেরণ করা হইল। বলা বাহুল্য, সে ব্যক্তি কেবল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। কোন্ হিন্দু প্রাণ থাকিতে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারে? পর দিবস নবাবের সৈন্য নাটোর আক্রমণ করিল। রাণী ভবানী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বয়ং সৈন্যের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন। মুসলমান সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাণী তাহাদিগকে পরাজিত ও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৩

সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে দেশ উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। ছোট বড় সকলেই তাঁহার ভয়ে সশঙ্কিত। একদিন জগৎ শেঠের গৃহে এক মন্ত্রণা সভা বসিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায় দুর্ল্লভ প্রভৃতি এই সভার অধিনেতা। রাণী ভবানীও নিমন্ত্রিতা হইয়া সভায় আসিয়াছিলেন। জগৎ শেঠ প্রস্তাব করিলেন, মীর্জ্জাফরকে সিংহাসন

প্রদান করা হউক। তিনি আমাদের অভিমতানুযায়ী রাজ্যশাসন করিতে স্বীকৃত আছেন। বিশেষতঃ তিনি নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ। সমগ্র মুসলমান সৈন্য তাঁহার অধীনে। তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলে অনর্থক রক্তপাতেরও সম্ভাবনা নাই, অথচ আমাদের কার্য্যোদ্ধারও হইবে।' রাণী ভবানী তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'কোন হিন্দু নরপতিকে সিংহাসনে বসান কি সম্ভবপর নয়? আমার বোধ হয় ইহাই উপযুক্ত সময়।' রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, 'কার না সে ইচ্ছা? কিন্তু এ যাবৎকাল বিদেশীর অধীনে থাকিয়া আমরা নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। এমন উপযুক্ত সৈন্য নাই যে বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত আমাদের মধ্যে একতার বড়ই অভাব, আছে কেবল দ্বেষ আর হিংসা। কোন হিন্দু রাজাকে সিংহাসন প্রদান করিলেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে এবং সেই সুযোগে মহারাষ্ট্রগণ আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে। মুসলমান বিদেশী হইলেও অনেক দিন তাহাদের সহিত বাস করিতেছি। এখন

কাহিনী।

মহারাষ্ট্রগণ সম্পূণ আমাদের নিকট অপরিচিত। এ ক্ষেত্রে মুসলমানেরই সহায়তা গ্রহণ আমার মতে যুক্তিসঙ্গত।'

'স্বীকার করিলাম, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। কিন্তু মনে করুন, মীর্জ্জাফরও যদি সিংহাসন পাইয়া সিরাজের ন্যায় আচরণ করেন, তখন আমাদের উপায় ?'

রাজা রাজবল্লভ বলিলেন, 'আমরা তার উপায় স্থির করিয়াছি। মীর্জ্জাফরকে শাসনে রাখিবার জন্যই আমরা ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করিতেছি। তাহারা অতি ক্ষমতাশালী কিন্তু ব্যবসায়ীর জাতি, সিংহাসনের প্রতি তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা পাইলেই তাহারা সর্ব্বদাই আমাদের সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাহাদের সাহায্যেই আমরা মীর্জ্জাফরকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইব।'

'বিশেষতঃ সিরাজ কলিকাতায় ইংরাজদের দুর্গ ধ্বংস করিয়া একরূপ তাহাদের বিরাগভাজন হইয়াই আছেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই সিরাজকে শাস্তি দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আবার যদি

মীর্জ্জাফরও তাহাদের সহিত সদ্‌ভাব রাখিয়া কাজ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও ইংরাজদের অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে।' এই বলিয়া মহামতি জগৎ শেঠ রাজার উক্তির সমর্থন করিলেন।

রাজা রায়দুর্ল্লভ বলিলেন, 'আমিও শুনিয়াছি, সেদিন ইংরাজরা দাক্ষিণাত্যের নবাবকে অকাতরে পরাস্ত করিয়াছিল।'

'মহারাজগণ! আমি সামান্য রমণী মাত্র। এরূপ গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগকে কোন উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য, তবে অন্তত আমার ভ্রম সংশোধনের নিমিত্ত দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। অনুমান করুন, যদি ইংরাজই মহারাষ্ট্রদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর এবং রাজ্যাভিলাষী হয়, মনে করুন যদি রাজ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তে শাসনকর্ত্তর পদ বরণীয় মনে করে, তখন তাহাদিগকে কিরূপে দমন করিবেন? মহারাষ্ট্রগণ বরং আমাদের স্বদেশবাসী কিন্তু ইংরাজ বিদেশী। আমি মীর্জ্জাফর কিম্বা মহারাষ্ট্র কিম্বা ইংরাজ কোন পক্ষই সমর্থন করিতে চাহি না। স্বর্গীয় নবাব আলিবর্দ্দীর

নিকট আমরা অনেক প্রকারে ঋণী। আমার ইচ্ছা, সিরাজ অত্যাচারী,—সিরাজের পরিবর্ত্তে তাঁহার অন্য কোন বংশধরকে সিংহাসন প্রদান করুন।'

এইরূপে বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর রাণী ভবানী মীর্জ্জাফরের পক্ষেই মত দিলেন, কিন্তু বলিলেন, 'মহারাজগণ! আমি আপনাদের প্রস্তাবেই মত প্রদান করিলাম, কিন্তু আমার মন যেন বলিতেছে—আমাদের এ ষড়যন্ত্র দেশের পক্ষে কখনও মঙ্গলপ্রদ হইবে না।' সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

* * *

যথাসময়ে পলাশীর বিস্তৃত প্রান্তরে এক যুদ্ধাভিনয় হইল। মীর্জ্জাফর ধীরে ধীরে ইংরাজদের সহিত যোগ দিলেন। সিরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মীর্জ্জাফর নবাব পদে অভিষিক্ত হইলেন।

৪

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন, পলাশীর যুদ্ধের পর অনেকদিন ধরিয়া বাংলায় ঘোরতর অরাজকতার

স্রোত বহিয়াছিল। ইংরাজেরা অর্থের নিমিত্ত মীর্জ্জাফরকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে বসাইলেন, আবার কিছুদিন পরে মীরকাশিমকে সরাইয়া মীর্জ্জাফরকে পুনঃ-স্থাপিত করিলেন। কিছুকাল ধরিয়া এইরূপই চলিতে লাগিল। সে কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই।

* * *

রাণী ভবানীর জীবনের শেষকাল বেশ সুখে ও শান্তিতে কাটিয়াছিল। তাঁহার পুত্র ছিল না, এজন্য তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার হস্তে রাজ্যের সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

মুর্শিদাবাদের অতি সন্নিকটেই গঙ্গার উপর এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই তিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে, দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে, ধর্ম্মমন্দির গঠন, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি করাইতে সহস্র মুদ্রা তিনি ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কাশীধামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেব-মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে।

কথিত আছে, তিনি বাৎসরিক প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা কেবল অতিথি-সেবায় ব্যয় করিতেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ঊন-আশি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

তাঁহার গৃহীত পুত্র রাজা রামচন্দ্র ধর্ম্মাচরণেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। প্রায় সমুদয় সম্পত্তিই তিনি দরিদ্রের দুঃখ-বিমোচনের জন্য অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন এবং অবশিষ্ট সুশাসনের অভাবে বিক্রয় হইয়া যায়। এখন অতি সামান্য অংশই তাঁহার বংশধরগণ উপভোগ করিতেছেন। সদাশয় ইংরাজরাজ এখনও পর্য্যন্ত রাণী ভবানীর সম্মানার্থ উক্ত পরিবারবর্গকে মহারাজ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন।

'অসামান্যা।'

১

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে—আলিবর্দ্দীর জীবনের শেষ অবস্থায় বাঙ্গালায় ভীষণ অত্যাচারের আরম্ভ হয়। নবাবের দৌহিত্র সিরাজ নবাবের অত্যধিক স্নেহে অন্ধ হইয়া সেই অনলে ক্রমান্বয়ে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। নবাব নাজিম আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজই বাঙ্গালার রাজতক্তে উপবেশন করেন। কতিপয় অসচ্চরিত্র যুবকের সাহচর্য্য মিলিল। এতদিন যে সকল কার্য্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইত, এক্ষণে তাহা প্রকাশ্যে চলিতে লাগিল। গৃহস্থের রূপবতী স্ত্রী কন্যার সতীত্ব রক্ষা একবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণের পুরমহিলাগণ অবধি নিস্তার পাইতেন না। সকলেই সশঙ্ক,—সকলেই ম্রিয়মান।

এই সময়ে জগৎশেঠগণই মুর্শিদাবাদের মধ্যে

সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও বণিক্‌শ্রেষ্ঠ ব'লিয়া পরিচিত। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগের বিস্তৃত ধনাগারের এক একটি শাখা ছিল। দেশের রাজা, মহারাজা, ধনী মহাজনগণ পর্য্যন্তও অভাবের সময় ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই শেঠ বণিকগণের মধ্যে মহাতব চাঁদই বিশেষ গণ্যমাণ্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা ছিল—নাম 'অসামান্যা।' সিরাজ রাজ-তক্তে বসিয়া তাঁহার রূপের প্রশংসা শুনিলেন, কিন্তু মহাতব শেঠের ন্যায় প্রতিপত্তি-সম্পন্ন বণিকের কন্যাকে প্রকাশ্যভাবে অপহরণ করা নিতান্ত সহজ-সাধ্য নয় ভাবিয়া তিনি মনে এক কৌশল স্থির করিলেন।

একদিন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সিরাজ এক অপরূপ সুন্দরীর বেশ ধরিয়া জগৎশেঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 'অসামান্যা' যে গৃহে শয়ন করিতেন, সেই গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নহে। তিনি দেখিলেন, তাঁহারই বাঞ্ছিতা যেন স্বর্গের সমুদয় সৌন্দর্য্য—সমুদয় রূপ—সমুদয় শোভা স্বদেহে প্রতি-

ফলিত করিয়া তাঁহারই সম্মুখে এক অপূর্ব্ব ভাস্বর প্রতিমা দণ্ডায়মানা। সিরাজ বুঝিতে পারিলেন না, তিনি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে—জাগ্রত না স্বপ্নাবিষ্ট!

সিরাজ যখন তন্ময় হইয়া স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন, সে সময় 'অসামান্যা' এক• অপরিচিতকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে স্বামীর নিকট পলায়ন করেন। তাঁহার স্বামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমুদয় ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সিরাজের এই স্পর্দ্ধা ও দুঃসাহসের উপযুক্ত পুরস্কার* প্রদান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহার স্বামীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। রৌপ্যপাত্রে করিয়া সেই মুণ্ড জগৎ শেঠের কন্যার নিকট উপহার আসিল †। এ ব্যাপারে শেঠ গৃহে

* পাদুকা প্রহার।

† অসামান্যার স্বামীর প্রতি সিরাজের এই অত্যাচারের বর্ণন মন্মথ বাবুর 'The Heroines of Ind' হইতে গৃহীত। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে সিরাজ-চরিত্র অন্যরূপ। এ সম্বন্ধে বিশদরূপে জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা' নামক পুস্তক পাঠ করুন।

কাহিনী।

শোকের ঝড় বহিয়া গেল। বণিক-কন্যা সেই শোকের দারুণ তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদিনী হইলেন।

২

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সিরাজের ব্যবহারে দেশবাসী একবারে উত্যক্ত হইয়া উঠিল। অত্যাচারির হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত নানারূপ কল্পনা চলিতে লাগিল। পরিশেষে একদিন স্থির হইল, ইংরাজের সাহায্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করাইয়া তাহার স্থানে মির্জাফরকে নবাব পদে অভিষিক্ত করা হইবে। ইংরাজ প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সহায়তা করিতেও প্রস্তুত আছে।

তাহাই হইল। সিরাজ পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মির্জাফরের পুত্র মিরণের আদেশে মহম্মদি বেগ নামক এক প্রতিহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হন।



অসামান্যা

K. V. Seyne & Bros.

'অসামান্যা' এতাবৎকাল উন্মাদিনীর ন্যায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। বহু চিকিৎসাতেও তাঁহার কোন উপকার দর্শিল না। সিরাজের হত্যা সংবাদে অনেকে স্থির করিলেন,—সতী স্বামী শোকে বিহ্বলা। প্রতিহিংসার দাবানল তাঁহার হৃদয়কে পলে পলে ভস্মীভূত করিতেছে। সিরাজের মৃতদেহ যেখানে সমাহিত হইয়াছিল, সেই স্থানে একবার লইয়া যাইলে, বোধ হয়, অনেকটা মনের জ্বালা নিবারণ হইতে পারে—এমন কি উন্মত্ততাও আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর। সঙ্কল্প-অনুযায়ী কার্য্য হইল। উন্মাদিনীকে সিরাজের কবর দেখাইতে আনা হইল। 'অসামান্যা' কি জানি কেন বহুক্ষণ ধরিয়া শ্বেতমর্ম্মর রচিত স্তম্ভের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয়, অনেক দিনের পুরান কথা আবার নূতন করিয়া মনে জাগিয়া উঠিল—অথবা মানবের জীবন-নাট্যের অভিনয় কোনখানে কি ভাবে সমাপ্ত হয়, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন!

* * *

স্বামীর মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ দুইটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। 'অসামান্যা' এতদিনে অনেকটা

প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন। আজ কয়দিন হইতেই তিনি সিরাজের সমাধির নিকটে এক প্রাসাদে বাস করিতেছেন। অনেক সময়েই 'অসামান্যা' সমাধির দিকে চাহিয়া কি ভাবেন—কখন বা মনকে জিজ্ঞাসা করেন 'কে এ হতভাগ্য, বসন্তের প্রারম্ভেই শোভায় সৌন্দর্য্য ফুটিয়া না উঠিতেই ঝরিয়া পড়িয়াছে! এই কি নবাব সিরাজদ্দৌলা! কে যেন পরোক্ষে থাকিয়া উত্তর দেয়, 'হাঁ, এই তোমার স্বামীহন্তা, অত্যাচারী নবাব সিরাজদৌল্লা।' আবার কথন তিনি ভাবিতেন, 'পাপীর শাস্তি ভগবান দিয়াছেন। কিন্তু আমার হৃদয়ের জ্বালা নিভিতেছে না ত! সিরাজ তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছ—ঘুমাও, কিন্তু তোমার আত্মা ঊর্দ্ধ হইতে দেখুক—'আসামান্যা' প্রতিহিংসা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তিতে কি নির্ম্মল আনন্দ, কি পূর্ণ শান্তি! তাহাতে জীবন কেমন জুড়াইয়া যায়।

৩

একদিন মধ্য রাত্রে 'অসামান্যা' গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল,—কেহ জানিল না।

সেই গভীর রজনীতে 'অসামান্যা' ক্রমাগত পথ চলিলেন ; নির্দ্দিষ্ট কোন গন্তব্য স্থান নাই—শুধুই চলিয়াছেন। ক্রমে ভগবান গোলার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি শুনিলেন, সিরাজের প্রিয়তমা বেগম লুৎফন্নিসা যখন সিরাজের সহযাত্রী হইয়া পলাইয়া বেড়াইতে-ছিলেন, সেই সময় এই স্থানে তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঠিক তৎকালেই সিরাজ মির্জাফরের অনুচরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন। সে আজ প্রায় মাসাধিক কাল। এযাবৎ লুৎফ্ একটি স্ত্রীলো-কের গৃহে আশ্রয় লইয়া বাস করিতেছিলেন। অসামান্যা তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। লুৎফ্ এ সংবাদ পাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন—ইচ্ছা হইল, একবার দিল্লীতে সম্রাটের নিকট যাইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন! দুই মাসের শিশুটিকে বক্ষে ধরিয়া লুৎফ প্রাণ ভয়ে ছুটিলেন। 'অসামান্যা'ও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল, কেহই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

৪

সে এক বড় ভয়ঙ্কর দিন। প্রভাতের প্রারম্ভ হইতেই ভীষণ ঝড় নামিয়াছে। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, ঝড়ও তত উগ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। প্রকৃতি আজ যেন বিশ্বের সহিত বাদ সাধিবার জন্য রণচণ্ডী বেশে সাজিয়া উঠিয়াছে। এই ভীষণ দুর্য্যোগে এক অসহায়া যুবতী কি একটা দ্রব্য বক্ষে চাপিয়া পাগলিনীর ন্যায় নদীর পথে ছুটিয়াছে, আর তাহার পশ্চাতে আর এক রমণী তাহাকেই ডাকিতে ডাকিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে। বালা ভয়বিহ্বলা, বাহ্যজ্ঞান-রহিতা—রমণীর সে চীৎকার তাহার কর্ণে পৌঁছিল না। বালা নদীর তীরে আসিয়া দেখিল, কতকগুলি মাঝি ঝড়ের ভয়ে নৌকা বাঁধিয়া তীরে বসিয়া আছে। যুবতী পার করিয়া দিবার জন্য তাহাদিগকে বহু অনুনয় অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু কেহই সে দুর্য্যোগে নৌকা খুলিতে সাহস করিল না,—পরে একজন তাহার হস্তের এক বহু মূল্য অঙ্গুরীয়ের প্রলোভনে অবশেষে স্বীকৃত হইয়া নৌকা খুলিল।

অনুসারিণী রমণী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একখানি নৌকা গঙ্গার উত্তাল বারিরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অপর পারে চলিয়াছে —তরঙ্গাঘাতে নৌকা একবার উঠিতেছে, আবার নামিতেছে—প্রতিক্ষণেই মনে হয়, এইবার বুঝি ডুবিল! শেষে সত্যই তাহা ঘটিল। একটা চঞ্চল বাতাসে নৌকা হঠাৎ উলটিয়া গেল, আর উঠিল না— শুধু এক করুণ চীৎকার সেই ভীষণ দুর্য্যোগের বক্ষ ফিরিয়া বিদ্যুতের মত ফুটিয়া উঠিল! তাহার পর আবার ঝড়ের সেই মর্ম্মভেদী হুহুঙ্কার—বায়ুর গর্জ্জন, নদীর জলকল্লোলের উপর প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্য চলিতে লাগিল!

'অসামান্যা' তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। যখন দেখিলেন, নৌকা আরোহীসহ নদীগর্ভে ডুবিল, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চকিতে তিনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তরঙ্গের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে যে স্থানে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া দেখিলেন, অদূরে লুৎফের অচেতন দেহ নদী-বক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে। 'অসামান্যা' বহু কষ্টে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতে

কাহিনী।'

ডুবিতে লুৎফকে তীরে আনিলেন। হতভাগিনীর শেষ নিশ্বাস অনেকক্ষণ বহিয়া গিয়াছে, তথাপি সেই শিশুটিকে বেশ করিয়া আকড়াইয়া রহিয়াছে, পাছে অসাবধানতাবশতঃ তাহার বক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে—নদী ছিনাইয়া লয়!

জননীর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইলেও, শিশুর প্রাণ তখনও পর্য্যন্ত দেহচ্যুত হয় নাই। 'অসামান্যা' বহু যত্নে শিশুর জীবন রক্ষা করিলেন এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততকাল শিশুর লালনপালন করিয়া নারীসমাজে এক সুমহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক গৃহে এখনও তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে!

অহল্যা বাঈ।

১

মহারাষ্ট্র প্রদেশের মধ্যে ইন্দোর একটি প্রতিষ্ঠা-পন্ন রাজ্য। হোলকার বংশীয়গণ ইহার শাসনকর্ত্তা। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরাধিপতি মল্‌হর রাও পর-লোকগত হন এবং তাঁহার পৌত্র মালিরাও সিংহাসনে অধিরোহন করেন। মালিরাওয়ের বিধবা মাতা অহল্যা দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে ধর্ম্ম-কর্ম্মেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। নবীন ভূপাল অতি অল্প দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াই অকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন! তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, কাজেই রাজমাতা অহল্যা দেবীকেই স্বামী ও পুত্রশোকের মধ্যেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। অহল্যা দেবী আজীবন অসাধারণ সাহসী ও বুদ্ধিমতী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কেবল বুদ্ধি বলেই তিনি এত বড় ইন্দোর রাজ্য নিজ আয়ত্তাধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ প্রায় শত বৎসরের অধিক অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার

নাম এখনও পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের প্রতি গৃহে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর কত রাজা ইন্দোরের সিংহাসন সুশোভিত করিয়াছেন কিন্তু কেহই তাঁহার ন্যায় প্রাণ খুলিয়া প্রজার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই। তিনি সকলের মাতৃস্থান অধিকার করিয়া মাতৃস্নেহে ইন্দোরবাসিগণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। একপুত্র হারাইয়া অসংখ্য পুত্রের জননী হইয়াছিলেন।

দুর্ব্বলের উপর সবলের বল প্রয়োগ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? রমণীকে সিংহসানে দেখিয়া মন্দ-প্রকৃতির লোক সকল নানা উপায়ে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু অহল্যা দেবী বিলাসপ্রিয়া রমণী ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালিনী শাসনকর্ত্রী বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও ইন্দোর সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। তিনি স্বয়ং সকল রাজকীয় কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেন—রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন—প্রজার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার তাঁহার সহ্য হইত না—প্রজার সন্তোষ

বিধানই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। দুর্জ্জনগণ স্ব স্ব অভিলাষ পূরণে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া দ্বিতীয় উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

গঙ্গাধর যশোবন্ত ইন্দোর-রাজের কুলপুরোহিত। তিনি অনেক সময়েই রাজ-কার্য্যের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন। অহল্যা দেবী একদিন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি কুলপুরোহিত। আপনি আমাকে ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবেন, মস্তক অবনত করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি; কিন্তু রাজকার্য্য বিষয়ে আমাকে কোন অনুরোধ করিবেন না। রমণী হইলেও রাজকার্য্য আপনা হইতে আমি বোধ হয় ভালই বুঝি। রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিশেষ-রূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া আমি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না। প্রজারঞ্জনই আমার চরম লক্ষ্য।" রাণীর কথায় পুরোহিত-প্রবর জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসা-গ্রহণের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

মধুরাও ইন্দোর রাজ্যেরই পূর্ব্বতন এক শাসন-কর্ত্তা ছিলেন,—রাঘব দাদা তাঁহার দূর সম্পর্কীয়

পিতৃব্য। ইন্দোর-রাজ্যে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। অনেকে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। গঙ্গাধর তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া অহল্যা দেবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। একদিন প্রকাশ্য ভাবে অহল্যা দেবীকে একখানি পত্র দিল—তাহাতে লেখা ছিল :—

"ইংরাজ ও রাজপুত—এই উভয় শত্রু বর্ত্তমানে ইন্দোর-সিংহাসনে রমণীর উপবেশন শোভা পায় না। এ ক্ষেত্রে পোষ্যপুত্র গ্রহণ এবং প্রতিনিধি নিয়োগই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি এতদনুসারে কার্য্য না হয়, তাহা হইলে সত্বরই দেশে ঘোরতর অশান্তির উদয় হইবে। অতঃপর সাবধান হইবেন। ইতি—

রাঘব দাদা।"

২

রাণী অহল্যা দেবী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া এই সকল ষড়যন্ত্র-কারিদিগের কার্য্য-কলাপাদির অনুসন্ধান লইতে

ছিলেন। রাজসৈন্যদিগকে সর্ব্বদা বিপদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন—যেন এতটুকু সুযোগ পাইয়া শত্রুগণ রাজ্যের মধ্যে অকারণ কোন গোলযোগ বাধাইয়া না বসে। এইরূপে সকল দিক সুশৃঙ্খল করিয়া তিনি রাঘব দাদার পত্রের উত্তর পাঠাইলেন :—

"তোমরা মনে করিয়াছ আমি তোমাদের ভয়ে ভীত হইয়া দেশে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিব? জেন, আমি মহারাষ্ট্র রমণী। আমার ক্রোধ উদ্দৃপ্ত করিয়া নিজেদেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা করিয়া তুলিতেছ মাত্র। রাজ কার্য্যের অনুরোধে আমি তোমাদের বন্দী করিবার আদেশ দিলাম।" এই পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সদল বলে বন্দী হইয়া রাজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

গঙ্গাধর যশোবন্ত রাজসভায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। অন্যান্য বন্দীগণও একে একে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া বন্ধনমুক্ত হইল। রাঘবদাদাও মুক্ত হইলেন কিন্তু ইন্দোর রাজ্যে আর তাহার স্থান হইল না। এ লাঞ্ছনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না,—প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গোপনে রাজপুতদিগের

সহিত যোগ দিয়া ইন্দোর-রাজ্য আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

অহল্যা দেবী পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনিও রাজপুতদিগের সহিত সমকক্ষ হইবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তুকাজী হোলকার নামক এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধক্ষ্য করিয়া তাঁহার অধীনে সৈন্য শিক্ষার ভার দিলেন। তুকাজী হোলকার একজন উপযুক্ত ব্যক্তি—অতি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও সৈন্য বিভাগে তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্মপটুতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন। রাণী তাঁহার বুদ্ধি-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সৈন্যাধক্ষ্যের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

রাজপুতগণ আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ইন্দোর রাজ্য আক্রমণ করিলেন—সীমানা অতিক্রম করিয়াই একটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র অহল্যা দেবী তুকাজীর অধীনে পঞ্চ সহস্র সৈন্য দিয়া দুর্গ পুনরধিকারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তুকাজী দুর্গ পুনরধিকার করিয়া রাজপুতদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে অহল্যা দেবীর জীবিতকালের মধ্যে

আর তাঁহারা দ্বিতীয়বার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন নাই।

৩

অহল্যা দেবী যে কেবল বীর-হৃদয়া ছিলেন, তাহা নহে,—স্বহস্তে সৈন্য-চালনায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শনে রমণীকুলে অদ্বিতীয়া ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রজারঞ্জনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইন্দোরবাসিগণের জীবন, ধন, ঐশ্বর্য্য যাহাতে নিরাপদে রক্ষা পায়, এ বিষয়ে তিনি সুদৃঢ় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ইন্দোর-রাজ্য পরিপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিয়াছিল। তিনি যখন স্বহস্তে রাজ্য গ্রহণ করেন, সে সময় দস্যু তস্কর ও ঠগীদিগের অত্যাচারে দেশবাসিগণের আতঙ্কের সীমা ছিল না—তিনি রাজ্যে শান্তি-স্থাপনের জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। অহল্যা দেবীর এক অপরূপ সুন্দরী কন্যাছিল—নাম মুক্তা। তিনি একদিন প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,

কাহিনী।

"যিনি আমার রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া ভীত অধিবাসিগণকে দস্যু তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ আমি আমার একমাত্র কন্যাকে সাদরে সমর্পণ করিব। যতদিন না দেশে শান্তি স্থাপিত হয়, ততদিন আমার কন্যা অবিবাহিত থাকিবে।"

যশোবন্ত রাও নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবক অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ হইতে অশান্তি দূর করিয়া রাণীর স্নেহভাজন হন ; এবং তিনিও প্রতিজ্ঞানুযায়ী তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

অহল্যা দেবী সুবিচারক ছিলেন। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একদা শিরকামদাস নামক এক ধনী ব্যবসায়ী প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় তাঁহার বিধবা পত্নী পোষ্যপুত্র গ্রহণের অভিলাষ জানাইয়া রাজ-সরকারে আবেদন করেন। রাণীর কোন এক প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া

তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। রাণী এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া বিধবার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করাইলেন এবং বিধবাকেও পোষ্যপুত্র গ্রহণে আদেশ দিলেন।

আর একবার এইরূপ দুইটী ধনী বণিক অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের বিধবা পত্নীদ্বয় রাণীর নিকট আসিয়া আবদন করেন যে তাঁহারা তীর্থ যাত্রা করিবেন—ধন, ঐশ্বর্য্য আর তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। সেই সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করুন। অহল্যা দেবী তাঁহাদের সরল ব্যবহারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অতি মিষ্ট কথায় বলিলেন, "ভগ্নী আমায় ভগবান যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে প্রচুর—ইহা অপেক্ষা অধিক অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। তোমরা এই অর্থ পরোপকারে ব্যয় করিয়া যাও। ভগবান তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" রাণীর উপদেশানুযায়ী তাঁহারা জলহীন স্থানে পুষ্করিণী ও দরিদ্রদিগের জন্য ভাণ্ডার স্থাপন করাইয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে কালবিলম্ব করিলেন না।

কাহিনী।

অহল্যা দেবী অতি সরল ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বিলাসিতার নাম মাত্রও তাঁহার ছিল না। রাণী হইলেও তাঁহার পরিধেয় সাধারণ বিধবা রমণীর ন্যায়ই ছিল—তাহাতে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হইত না। সৎকার্য্যে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। পুষ্করিণী খনন, অতিথিশালা স্থাপন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তাঁহার সৎকার্য্যের অসংখ্য নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। গয়ার বিখ্যাত বিষ্ণুপদ মন্দির অহল্যা দেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। স্থাপত্য নৈপুণ্যে এ মন্দিরটিও গয়ার অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর সুখে ও শান্তিতে রাজত্ব করিয়া অহল্যা দেবী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইন্দোরবাসী যে রত্ন হারাইল তাহা আর কখন পূরণ হইবে কি না জানি না তবে তাঁহার যশঃ সৌরভ আবাহমানকাল প্রবাহিত থাকিয়া ভারত রমণীর সম্মুখে এক উজ্জ্বল আদর্শ ধরিয়া রাখিবে।

কৃষ্ণকুমারী।

কৃষ্ণকুমারী উদয়পুরের মহারাণার কন্যা। অতুলনীয়া রূপসী বলিয়া ইঁহার খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই রাজপুতনাময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বহু দূর দেশ হইতেও রাজকুমারগণ ইঁহার পাণি-গ্রহণে উৎসুক হইয়া ইঁহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু মহারাণা জয়পুরাধিপতি রাজা জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর পরিণয় স্থির করিলেন। জয়পুর অধিপতি এই সংবাদে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মহারাণার নিকট তিন সহস্র সৈন্য-সমভিব্যহারে নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত যেমন প্রচার হইয়া পড়িল, অমনি সমগ্র রাজপুতনাময় সমরভেরী বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে রক্তের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং দ্বেষ ও কলহে সমস্ত দেশ উৎসন্ন হইতে বসিল। কৃষ্ণকুমারীর অনুপম রূপরাশি ও লাবণ্যই এই যুদ্ধের মূল কারণ। 'মাড়োয়ার-পতি' রাজা মণিসিংহও

ইঁহার পাণি-গ্রহণে অভিলাষী ছিলেন। তিনি মহারাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার পূর্ব্বে যিনি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে এখন আমিই উত্তরাধিকারী; অতএব আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন।" তিনি আরও বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে জানিবেন, সত্বরই উদয়পুরে ঘোর অশান্তির ঝড় বহিবে।"

মেবারের মহারাণা যদিও তৎকালে রাজপুতগণ মধ্যে মুখ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তথাপি তাঁহার শক্তি এমন কিছু প্রবল ছিল না। ছোট ছোট রাজাগণ, যাঁহারা ইঁহার অধীন ছিলেন, সর্ব্বদাই নিজ নিজ সৈন্য লইয়া ইঁহার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। যে সময় কৃষ্ণকুমারীর জন্য সমগ্র রাজপুতানা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, সেই সময় মহারাষ্ট্র-প্রধান 'সিন্ধিয়া-অধিপতি' বার বার রাজস্থান আক্রমণ করিয়া রাণা, মহারাণা ও সর্দ্দারগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক 'চৌথ' গ্রহণ করিতেছিলেন। মেবারের মহারাণাকেও 'চৌথ' প্রদান করিতে হইত।

যে রাজপুতজাতি ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক অনন্ত দুঃখ ও ক্লেশ পাইয়াও কখন নতশির হয় নাই, সেই রাজপুতজাতি তখন দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক মেষপালের ন্যায়ই লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত।

নবাব আমীর খাঁ মুসলমান হইলেও উন্নত চরিত্র রাজপুতদিগের মধ্যে মহাশূরবীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন কিন্তু ছলনা এবং প্রবঞ্চনায় তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। যখন তিনি দেখিলেন যে রাজপুত শক্তি গৃহ বিচ্ছেদে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তখন তিনি মাঝে মাঝে কোন কোন সর্দ্দারকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আমীর খাঁ সমস্ত রাজপুত সর্দ্দারদের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছিলেন। মাড়োয়ারের মহারাণা মণিসিংহকে মহারাজা 'সিন্ধিয়া' সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন, আমীর খাঁও মহারাণা 'উদয়পুরকে' সাহায্য করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং অন্যান্য রাজপুত সর্দ্দারগণ জয়পুরাধিপতি রাজা জগৎসিংহের জন্য জীবন পণ করিল।

মহারাজা 'সিন্ধিয়া' অষ্ট সহস্র সেনা লইয়া উদয়পুর নগর-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন;

কাহিনী।

এবং মহারাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন জয়পুর রাজের প্রার্থনা অস্বীকার করা হয়, এবং কৃষ্ণ-কুমারীর বিবাহ মাড়োয়ার-পতি মণিসিংহের সহিত সম্পন্ন করা হয়। মহারাণা 'উদয়পুর' এই বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। তখন মহারাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না। কাজেই তিনি জয়পুরের মহারাজার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া, সিন্ধিয়ার কথাই স্বীকার করিয়া লইলেন।

রাজা জগৎসিংহ এই সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এবং মহারাণা-উদয়পুরের দত্তবাক্য ভঙ্গের প্রতিশোধ লইবার জন্য এত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন যে সমগ্র রাজপুতানায় পূর্ব্বে তেমন কখনও একত্রিত হয় নাই। 'মাড়োয়ার'-অধিপতিও রাজা 'সিন্ধিয়ার' সহিত আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা রণক্ষেত্রে চিরতরে শায়িত হইলেন, কিন্তু কেহই পরাজয় স্বীকার করিলেন না। ইত্যবসরে আমীর খাঁ মহারাণা "উদয়পুরকে" পরামর্শ দিলেন যে, 'আপনি যুদ্ধের মূল কারণ, কৃষ্ণকুমারীকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করুন।' ইহা শুনিয়া প্রথমে মহা-

রাণা কোপান্বিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "এরূপ নিন্দনীয় কার্য্য আমার দ্বারা কখনই হইতে পারে না', কিন্তু আমীর খাঁ, তাঁহাকে বিবিধ প্রকার কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এই ঘৃণিত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন, এবং কৃষ্ণকুমারীকে নিধন করিবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা কে পালন করিবে?

প্রথমে মহারাণা নিজ শ্যালক রাজা দৌলত সিংহকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। রাজা দৌলত সিংহ তাঁহার আদেশ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এ কি বলিতেছেন? পিতা হইয়া সন্তান হত্যা? আমি মহারাণার এ আজ্ঞা কখনও পালন করিতে পারিব না।" অনন্তর মহারাণা কৃষ্ণকুমারীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জীবনদাসকে কহিলেন, "বৎস, তুমি কৃষ্ণকুমারীর জীবন-সংহার কর।" রাজা জীবনদাস নম্রভাবে উত্তর দিলেন, "পিতা, এ অধীনকে অমন কঠিন আদেশ করিবেন না, আমি আমার প্রিয় ভগিনীকে নিজ হস্তে দ্বিখণ্ডিত করিব?" রাজা কহিলেন, "বৎস! আমি কি করি? কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু যে সমস্ত দেশবাসীর বাঞ্ছনীয়।"

কাহিনী।

জীবনদাস তখন একখানি খড়্গ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকুমারীর নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃষ্ণকুমারী তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং বাল্যকালে যেরূপ মৃদু মধুর ভাবে আলাপ করিতেন, তেমনই মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তুমি পিতার নিকট হইতে কি আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছ?" জীবনদাস উত্তর করিলেন, "ভগিনী! আমি তোমার জীবননাশ করিতে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া কৃষ্ণকুমারী অস্ফুট হাস্য করিতে লাগিলেন। জীবনদাস, পূর্ব্বের ন্যায়ই গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভগিনী! আমি উপহাস করিতেছি না, মহারাণার ইহাই আজ্ঞা। তুমি দেশের হিতকামনায় নিজ প্রাণ উৎসর্গ কর। তোমার মৃত্যুর উপরই দেশের শান্তি নির্ভর করিতেছে।" কৃষ্ণকুমারী এবার সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। একবার নিজ সখিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং পরক্ষণে ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই! ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। পূর্ব্বেও কত শত ভাগ্যবতী রমণী দেশের হিত কামনায় নিজ নিজ প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আমারও সেই পবিত্র

রমণী কূলে জন্ম। আমিও প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। পূজনীয় পিতার আজ্ঞা উপেক্ষিত হইতে পারে না; তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি আপনার জীবন দান করিতে কুণ্ঠিত নহি। আমার তুচ্ছ প্রাণ-বিসর্জ্জনে যদি শত শত যোদ্ধার প্রাণ রক্ষা পায়, দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়া আসে, তবে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

ইহা শুনিয়া জীবনদাস নির্ব্বাক হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে বলিলেন, "ভগিনী! কি করি, পিতার আজ্ঞা।" কৃষ্ণকুমারী পূর্ব্বের ন্যায়ই অটল ভাবে বলিলেন, "ভাই, বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা কর। রাজাদেশ পালন কর।"

কৃষ্ণকুমারীর এই মিষ্ট এবং হৃদয়-ভেদী বচন শুনিয়া তাঁহার সখীরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। কৃষ্ণকুমারী বলিলেন, "প্রিয় ভগিনী-গণ, তোমরা নিরর্থক কেন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ? বরং আজ আনন্দ প্রকাশ কর। আজ আমার জন্য দেখ, রাজপুতের ঘরে ঘরে হাহাকার। আমার জীবন-দানে সে দাবানল নির্ব্বাপিত হইবে। তোমরা

আনন্দের সহিত আমায় বিদায় দাও। আমিও সুখে মৃত্যুকে বরণ করি।”

জীবনদাস এতক্ষণ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্ত হইতে খড়্গ খসিয়া পড়িল। তিনি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে রাজভবন পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে মহারাণা অন্যান্য সর্দ্দারগণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কেহই সে কঠিন আদেশ পালন করিতে পারিল না। যখন রাজপুরে মহারাণার এই কঠোর আদেশ প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন পুরী হইতে গগনভেদী বিলাপ ও ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল। কিন্তু রাজকুমারীর মনে অথবা শরীরে কোনরূপ ভয়ের কিম্বা শোক ও দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি সেই প্রকারেই প্রাণত্যাগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া নিশ্চল প্রাচীরবৎ অটল অকম্পিত রহিলেন।

মহারাণা নিরাশ হইলেন। ইতিমধ্যে আমীর খাঁ সংবাদ পাইলেন, বহু রাজপুত সর্দ্দার নিজ নিজ সৈন্য লইয়া কৃষ্ণকুমারীর রক্ষার জন্য আসিতেছে। তখন সে দুর্ম্মতি মহারাণার নিকট যাইয়া

কহিল, "আপনি শীঘ্র কৃষ্ণকুমারীকে বধ করুন, নচেৎ মহা অনর্থ ঘটিবে।" কিন্তু কেহই আর অগ্রসর হইল না। তখন তিনি আজ্ঞা দিলেন, "যে কোন প্রকারে হউক, বিষদানে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা কর।" অগত্যা একজন দাসী বিষ-পাত্র হস্তে রাজকুমারীর নিকট আসিয়া কহিল, "রাজকুমারী, আপনার পিতা এই বিষপাত্র আপনাকে পান করাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন।" ইহা শুনিবামাত্র রাজমন্দিরে হাহা-কারধ্বনি উত্থিত হইল। সর্ব্বত্রশোক ও দুঃখের চিহ্ন, ক্রন্দনের রোল। রাজকুমারীর মাতা শোকে অভিভূতা হইলেন। কিন্তু শান্ত স্বভাব, ধীর গম্ভীর কৃষ্ণকুমারীর নেত্র হইতে এক বিন্দুও অশ্রু নিপতিত হইল না। তিনি তখনই বিষ-পাত্র দাসীর হস্ত হইতে লইয়া সখি-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয় ভগিনীগণ, এই আমাদের শেষ দেখা। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে তোমাদেরই মত সখী পাই।' পরে নিজ মাতৃদেবীর পদধূলি লইয়া কহিলেন, "মা! তুমি যদি শোকে ও দুঃখে কাতর হইয়া পড়, তাহা হইলে আমি ত নিশ্চিন্ত মনে মরিতে পারিব না। মা! চিরকাল পৃথিবীতে কেহই থাকিবে না, সকল-

কেই মরিতে হইবে; তবে কেহ বাল্যকালে, কেহ যুবাবস্থায় এবং কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া মরে। যদি এই নশ্বর শরীর পরের জন্য ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আমার জন্য সহস্র সহস্র রাজপুত-গৃহ শান্তিহীন হইতেছে, কত শত অবলা ও বালক-বালিকা অনাথ হইতেছে, অতএব আমার মৃত্যু হইলে দেশের কতদূর মঙ্গল হয়, একবার ভাবিয়া দেখুন। আপনি বুদ্ধিমতী, আমি আপনাকে আর কি উপদেশ দিব? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি পরলোকে নিশ্চিন্ত চিত্তে ও হৃষ্ট-মনে অবস্থান করিতে পারি।' তৎপরে তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'হে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মন্, আপনি সকল জীবের আধার এবং পালক। আপনি পিতার ধন ধান্য ও যশ বৃদ্ধি করুন, তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।' ইহা বলিয়া তিনি বিষপূর্ণ পাত্র ওষ্ঠের সহিত সংলগ্ন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পান করিয়া তাহা নিঃশেষ করিলেন।

বিষ পান করিবার পর তিনি আপনার ভ্রাতৃ বন্ধুদিগের সহিত সহজভাবে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষ উদর-মধ্যে থাকিতে পারিল

না, বমন হইয়া গেল। তখন দ্বিতীয় বিষপাত্র প্রস্তুত হইয়া আসিল, কিন্তু উহাও সেই প্রকারে বাহির হইয়া গেল। তাহার পর আর একটি বিষপাত্র দেওয়া হইল। কৃষ্ণকুমারী চক্ষু মুদিত করিয়া তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। এইবার বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। কৃষ্ণকুমারী চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন—সে চক্ষু আর খুলিল না। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইলে, সকলেই রাজকুমারীর অসীম সাহসিক কার্য্যের প্রশংসা ও তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং মহারাণার নির্দ্দয়তা ও আমীর খাঁর কুপরামর্শের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

গ্রন্থকার প্রণীত নূতন পুস্তক

ইতি-কথা

বহু সংখ্যক চিত্র সমেত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

প্রকাশক।